ভারত রহস্য

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৩৪

দাম পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার—শান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩এ, মদন মিত্রের লেন কলিকাতা

সূচীপত্র

ভারতের একত্ব

ভারত এক। কিন্তু কোথায় সে একত্ব, কি রকমের তাহা?

অনেকে বলেন ভারতের 'একত্ব' নাই · যাহা আছে ও সম্ভব তাহার নাম বড় জোর দেওয়া যাইতে পারে 'ঐক্য'। ঐক্য হইতেছে বহুল বিরোধী সত্তার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আর একই সত্তার আত্মগত যে অখণ্ডতা তাহাই একত্ব। আজ ভারতকে আমরা এক অখণ্ড গোষ্ঠিসত্তা অর্থাৎ "নেশন" বলিয়া ঘোষণা করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ভারত সে পর্য্যায়ের জিনিষ নহে। ভারত হইতেছে বহু বিচিত্র নেশনের সমবায়, একটা মহাদেশ। বাঙ্গালা একটা দেশ বা নেশন, মহারাষ্ট্র একটা দেশ বা নেশন, পঞ্চনদ একটা দেশ বা নেশন, তামিল ও অন্ধ্রদেশও এক একটা দেশ বা নেশন; কিন্তু

গোটা ভারতের একত্ব একটা ভৌগলিক ক্ষেত্রের একত্ব মাত্র। আর না হয় বলা যাইতে পারে, ভারত কতকটা এক, শিক্ষা দীক্ষা অর্থাৎ কাল্‌চার হিসাবে, ধর্ম্ম হিসাবে, আচার ব্যবহার হিসাবে, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা হিসাবে। ফলতঃ ইউরোপেরই সাথে ভারতের তুলনা করা উচিত। ইউরোপ যে হিসাবে এক, ভারতও সেই হিসাবেই এক— এক দেশ, এক নেশন, এক অখণ্ড গোষ্ঠিসত্তা হিসাবে নয়—ফ্রান্স, জার্ম্মাণী বা ইংলণ্ড যে হিসাবে এক সে হিসাবে নয়—কিন্তু চিন্তার ধারায়, মনের গড়নে, জীবনযাত্রার প্রণালীতে মোটামুটি একটা বিশেষত্ব আছে বলিয়া। অবশ্য ভারতে মুসলমান আছে, মোস্‌লেম প্রতিভা ভারতে অন্য রকম একটা সুর দিতে চেষ্টা করিতেছে; তবুও ভারতের বনিয়াদ, মূল প্রকৃতি আর্য্যপ্রতিভায়, এইটুকু স্বীকার করিতে পারা যায়—খৃষ্টান ইউরোপেও যেমন ইহুদীর স্থান হইয়াছে।

তাই কি? স্থূলদৃষ্টি দিয়া, বাহির হইতে হঠাৎ দেখিলে, এই রকম বোধ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বাহিরের রূপের পিছনে ভিতরে যে শক্তি খেলিতেছে, তাহার কিছু সন্ধান পাইলে আমরা দেখিতে পাইব অন্য রকমের বস্তু।

ভারতের একত্ব ভারতের অন্তরাত্মায়, ভারতশক্তিতে। ভারতে শিক্ষা দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে স্বভাবের গড়নে যে একটা একত্ব

দেখিতে পাই তাহা হইতেছে আরও ভিতরকার একটি সজীব সত্তার যে অখণ্ড একত্ব, তাহারই বাহিরকার প্রকাশ। ভারতের পিছনে রহিয়াছেন 'পুরুষমেকং', তিনিই ভারতের বিবিধ বহুল বৈচিত্রময় জীবনে সামঞ্জস্য ঐক্য একত্ব বিধান করিতেছেন। ভারতের অন্তর-পুরুষের যে আমিত্বের একত্ব তাহাই ক্রমে স্ফুট হইয়া অবতরণ করিতেছে, ভারতের একত্ব শুধু মনে নয়, ক্রমে প্রাণে ও দেহে পর্য্যন্ত মূর্ত্ত করিয়া ধরিতেছে।

সমস্ত ভারতকে একটা নেশন গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস এই ভারত-শক্তির অবতরণেরই চাপ মাত্র। ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য যে কেবল সম্ভব নয়, অব্যর্থ বলিয়া মনে হয় তাহারও হেতু এইখানে। ফলতঃ এই হিসাবে ইউরোপের সহিত ভারতের তুলনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাইবে। ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতিক ঐক্যসাধন একটা দুরূহ, এমন কি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। সে ঐক্য অর্থ armed neutrality—অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাকে তাকে বসিয়া থাকা। অতীতে আর এক রকমের ঐক্যের চেষ্টা হইয়াছিল বটে মাঝে মাঝে—কিন্তু সীজর, শার্লেমান্ (Charlemagne) বা নেপোলিয়ন যে ঐক্য দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা হইতেছে একটি বিশেষ দেশের ও জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য, অর্থাৎ ভক্ষ্য ও ভক্ষকের ঐক্য। আর এক প্রকারের ঐক্যও ইউরোপে আজকাল দেখা যাইতেছে—তাহা হইতেছে স্বার্থের জন্য

দল বাঁধা, ইউরোপের বাহিরে অন্যান্য দেশকে সভ্য করিবার, শোষণ করিবার নিমিত্ত ইউরোপের একজোট হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু এই রকমের কোন ঐক্যই একত্ব নয়। বিভিন্ন সার্থের মধ্যে যে চুক্তি বা রফা তাহা অন্তরাত্মার অব্যর্থ একত্ব নয়—সেখানে গোষ্ঠিপুরুষের অখণ্ড ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয় নাই।

বস্তুতঃ ইউরোপের অন্তর্গত যত দেশ, তাহাদের প্রত্যেকটির এক একটি সুঠাম সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রত্যেকে আলাদা আলাদা সার্থ্যকতা চাহিতেছে, প্রত্যেকে নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ. অপর হইতে পৃথক। পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান তাহাদের আছে, অনেক সময়ে এক সাথে এক উদ্দেশ্যে তাহারা মিলিয়া মিশিয়া চলে, কিন্তু প্রত্যেকের গোষ্টিগত পৃথক সত্তা কঠিন দৃঢ় রেখায় অঙ্কিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, কি জর্ম্মানীকে দেখ। প্রত্যেকের ভৌগলিক সীমা কেমন স্থির নির্দ্দিষ্ট যেন পৃথক মানুষের পৃথক এক একটা গোটা শরীর। ইউরোপে যে গোষ্ঠিসত্তা জীবন্ত জাগ্রত তাহা ইউরোপের প্রত্যেক দেশ বা নেশনের সত্তা, সমগ্র ইউরোপের গোষ্ঠিসত্তা নহে।

পক্ষান্তরে, ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি গোটা ভারতেরই আছে সেই সুষীম সুস্পষ্ট ভৌগলিক পরিধি। কিন্তু ভারতের যে বিভিন্ন খণ্ড দেশ তাহাদের সীমা তেমন দৃঢ়নির্দ্দিষ্ট নয়, তাহাদের ভৌগলিক আকার একটা সুঠাম অখণ্ড দেহ বলিয়া

মনে হয় না, তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে বটে, কিন্তু তাহাদের গোষ্ঠিগত সত্তা একের বিরুদ্ধে অপরে এতখানি পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্ব লইয়া খাড়া হইয়া উঠে নাই। ভারতের সাথে সাথে এশিয়ার কথা ভাবিলেই ভারতের ও ইউরোপের বৈষম্যটি স্পষ্ট ধরা পড়িবে। ভারতে একটা অখণ্ড রাষ্ট্র সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু সমগ্র এশিয়া লইয়া সে রকম কিছু সম্ভব মনে হয় না,—ঠিক ইউরোপেরই মত এশিয়ার যে বিভিন্ন দেশ তাহাদের আছে একান্ত পৃথক পৃথক জীবন-ধারা, পৃথক পৃথক সার্থকতা। ভারতের সাথে ইউরোপের সাদৃশ্য নাই, ইউরোপের সাদৃশ্য এশিয়ার সাথে।

ভারতকে যদি তুলনাই করিতে হয় তবে সে তুলনা-স্থল ইউরোপ নয়, তাহা বরং ইউরোপের অন্তর্গত একটা দেশ বা যাহাকে বলা হয় "নেশন"! ভারতের পর্য্যায়ে ইউরোপ নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের নাম করা যাইতে পারে। ইংলণ্ড একটা অখণ্ড দেশ বা নেশন, তাহার গোষ্ঠিসত্তার আছে একটা সজীব পৃথক ব্যক্তিত্ব—এই ইংলণ্ডের মধ্যে যেমন তাহার বিভিন্ন অঙ্গ বা অবয়বরূপে আছে ইংলণ্ড স্বয়ং, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স, সেই রকম ভারতের যে গোষ্ঠিপুরুষ তাহারই বিবিধ অঙ্গ হইতেছে বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ প্রভৃতি খণ্ডদেশ। তবে কথা এই, ইউরোপের তুলনায় এশিয়া যেমন অনেক বৃহৎ একটা মহাদেশ, সেই রকম এশিয়ার দেশগুলিও

ইউরোপের দেশগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর ছাঁচে গঠিত। চীন বা ভারতকে তাই দেশ নয়, এক একটা মহাদেশ বলিয়াই ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে বোধ হয়। ভারত শুধু আকারে যে বৃহৎ তাহা নয়, প্রকারেও তাহার মধ্যে তাই এত অগণিত বৈচিত্র দেখা দিয়াছে। ইউরোপের এক একটি দেশ বা নেশনের মধ্যে যে সকল ভেদ বৈচিত্র্য ক্ষুদ্রায়তনে বা অস্পষ্টভাবে আছে, ভারতে সেই সকল ভেদ ও বৈচিত্র্যই বিশাল হইয়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের দেশে যে সব খণ্ডতা নগণ্য বলিয়া প্রায় চোখে পড়ে না, ভারতের মধ্যে সেহ সব খণ্ডতা পুষ্ট পরিবর্দ্ধিত বলিয়া যেন এক একটা পৃথক ব্যাক্তিসত্তা (personality) লইয়াই উঠিয়াছে, তাহারাও যেন আবার নিজ নিজ পৃথক সার্থকতা খুঁজিয়া পাতিয়া লইতেছে।

সুতারাং দাঁড়াইল এই, ভারতের যে একত্ব তাহা ইউরোপীয় এক একটি নেশনের যে একত্ব তাহার তুলনায় অনেক বিশালতর জটিলতর একত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া সে একত্ব যে একত্ব নয়, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। বরং আমরা জানি, বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করিয়া দিতেছে, জীব ক্রমবিকাশের যত উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর স্তরে উঠিয়া চলে, ততই তাহার মধ্যে স্বগত ভেদ ফুটিয়া উঠে এবং এই ভেদ বাহুল্যকে সমন্বয়ে ও সামঞ্জস্যে বাঁধিয়া তোলাই শ্রেষ্ঠতর জীবের লক্ষণ। ভারতে এই রকমে একটা উচ্চতর

শ্রেষ্ঠতর সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে ও হইবে বলিয়াই তাহার মধ্যে এতখানি ভেদ ও বৈচিত্র এমন বিপুল এমন স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে।

ইউরোপে যে গোষ্ঠিগত একত্ব জাগ্রত সত্য তাহা সমগ্র ইউরোপের একত্ব নয়, তাহা হইতেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বা নেশনের মধ্যে যে একত্ব। অবশ্য গোটা ইউরোপ লইয়া একটা একত্বের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে একত্ব এখনও মনোময় লোকে, এখনও সেটি আদর্শ, তাহার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ইউরোপের অন্তর-পুরুষ আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন সজাগ হইয়া উঠে নাই। ভারতের কিন্তু এই অন্তর-পুরুষই আগে জাগিয়াছে, ভারতের গোষ্ঠিগত সত্তার যে ব্যক্তিত্ব তাহাই জীবন্ত সত্য। গোটা ভারতের যে একত্ব তাহা যেন স্বতঃসিদ্ধ, ভগবদ্দত্ত—ভারতে যে একত্ব বর্ত্তমানে সচেতন সজাগ হইতে চাহিতেছে তাহা গোটা ভারতের একত্ব ও ব্যক্তিত্ব নয়, তাহা হইতেছে ভারতের বিভিন্ন দেশের আপন আপন একত্ব ও ব্যক্তিত্ব। ইউরোপে ও ভারতে তাই দেখি যেন জীবন বিকাশের বিপরীত ধারা চলিয়াছে। ইউরোপে দেশে দেশে, খণ্ড খণ্ড আয়তনে প্রথমে গোষ্ঠির ব্যক্তিত্ব জাগিয়াছে, একত্ব সাধিত হইয়াছে—ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে আপনার সমগ্র আয়তনে বৃহত্তর একত্বের অভিমুখে সে উঠিয়া চলিয়াছে। ইউরোপের গতি বাহিরের স্থূলের অংশের চেতনা

হইতে ক্রমে ভিতরের সূক্ষ্মের সমগ্রের চেতনার মধ্যে আরোহণ। আর ভারতের হইতেছে সমগ্রের সূক্ষ্মের ভিতরে চেতনা হইতে ক্রমে বাহিরের স্থূলের অংশের চেতনার মধ্যে অবরোহণ। ভারত প্রথমেই পাইয়াছে ভারত-পুরুষের সন্ধান। এই ভারত-পুরুষ যেন চির জাগ্রত, তাই ভারতে হইয়াছে ভারত-পুরুষের প্রকাশ, ভারত-শক্তির অবতরণ—এই অবতরণের চাপেই ভারতের বিভিন্ন দেশ ক্রমে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, আপন আপন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাইতেছে। অন্তরাত্মার একত্ব পাইতে হইলে, আপন ব্যক্তিত্ব অধিকার করিতে হইলে, ইউরোপকে হয়ত আরম্ভ করিতে হইবে রাষ্ট্রনীতিক একত্ব বা ঐক্য ধরিয়া, ভারত তাহার অন্তরাত্মার একত্ব, সজাগ ব্যক্তিত্ব বহুদিন অধিগত করিয়াছে—ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রনীতিক একত্ব বা ঐক্য একত্ব-সাধনার শেষ কথা।

ভারত-মঙ্গল

ভারতে দেশাত্মবোধটা হয় ত নূতন জিনিষ অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ এক—ভারতের আছে একটা ভৌগলিক একত্ব, একটা জাতিগত একত্ব, একটা ধর্ম্মের একত্ব, কর্ম্মের একত্ব,. সুতরাং তার দরকার একটা রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতিক একত্ব, দরকার পৃথক ভাবে স্বাধীন ভাবে নিজ সত্তাকে সমৃদ্ধ করিয়া জমাট করিয়া গড়িয়া তোলা, অর্থাৎ এক কথায়, ভারত যে একটা 'নেশান'—এই জ্ঞানটার সম্বন্ধে সজ্ঞান আমরা হইয়াছি হয়ত ইদানীন্তন কালে, ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষ নামে একটা গোটা জীবন্ত জিনিষের সাথে আমাদের প্রাচীনেরা পরিচিত

ছিলেন না, তা মোটেও নয়। তবে আমাদের ধারণা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ধারণা দুই রকমের এই যা পার্থক্য।

আমাদের ঋষিরা ভারতকে দেশ হিসাবে ততখানি দেখিতেন না, যতখানি দেখিতেন একটা মূর্ত্ত ভাবের হিসাবে। তাঁহারা এই ভূভাগটির শাসন ব্যবস্থার ঐক্যের দিকে ততখানি নজর দিতেন না, ইহার যে আছে একটা সমষ্টিগত স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যবহারিক জীবন সে কথাও তাঁদের কাছে ততবড় ছিল না ভারতবর্ষকে তাঁহারা জানিতেন একটী পারমার্থিক সত্যের প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে। জগৎরহস্যের একটা তত্ত্বের প্রতীক এই ভারতবর্ষ। ভারতের একত্ব, স্বাতন্ত্র—এমন কি শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন এই দিক দিয়া—আর সে কথা তাঁহারা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন।

অবশ্য তাঁহারা যে ভাষায় বলিয়াছেন, সে ভাষা আজকাল আমাদের কাছে হেঁয়ালী। তাঁহারা বলিতেছেন, এই ভারতবর্ষ তার চতুঃসীমার মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, এর দক্ষিনেও মহাসাগর পূর্ব্বেও মহাসাগর আর উত্তরে হিমালয় আছে যেন ধনুকের ছিলার মত। এই ভারতবর্ষ সব জিনিষের বীজ—তদেৎ ভারতং বর্ষং সর্ব্ববীজং। এই "সর্ব্ববীজ" বলিতে তাঁহারা কি বুঝিতেন জানি না—তবে এ কথার পরে বলিতেছেন যে এখান হইতে দেবতা হওয়া যাইতে পারে, দেবতার রাজাও হওয়া যায়, আবার মর্ত্ত্যবাসীও হওয়া যায়। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ

দেশ। কারণ—আপনারা শুনিয়া চমকিত হইবেন না—ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, আর সব দেশ ভোগভূমি; অর্থাৎ—ইহাও তাঁহাদের নিজেদেরই কথা—এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষেই লোকে শুভ হউক আর অশুভ হউক কর্ম্ম করে, অন্যান্য স্থানে সেই কর্ম্মের অনুযায়ী ফল ভোগ করে মাত্র।

ভারতবর্ষের লোকেরাই কেবল কর্ম্মী, আর সব দেশের লোকেরা শুধু ভোগী—কথাটা আজকাল একটা বিপুল তামাসার মত শুনা যাইবে। বরং ঠিক উল্টো কথাটাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ কর্ম্ম সৃষ্টি করিতেছে, শক্তির বীর্য্যের নূতন নূতন রূপ অহরহ ফুটাইয়া তুলিতেছে ঠিক ভারতবর্ষ ছাড়া আর সব দেশ—ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান। আর সেই বস্তুর একটা ক্ষীণ অতিদূরের ছায়া বা প্রতিধ্বনি লইয়া বসিয়া বসিয়া ভোগ করিতেছে ভারত—নূতন কর্ম্মসৃষ্টি আর সব দেশের তুলনায় ভারত কি কতখানি করিয়াছে? ভারতবর্ষকে ত চিরদিন কর্ম্মের বিরোধী অধ্যাত্মবাদী বলেই পরিচয় দেওয়া হয়েছে—কর্ম্মী যদি কেহ হয় তবে সে ইউরোপ। আর কর্ম্ম করিতে জানে বলিয়া ইউরোপ যে ভোগও করিতে পারে না, তাহা নয় – ইউরোপ বিপুল কর্ম্ম যেমন করিতেছে, চূড়ান্ত ভোগও তেমনি করিতেছে। যদি খুব নিরপেক্ষ ভাবেই বিচার করি, তবে জোর বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষও একদিকে মহা মহা কর্ম্মীর আর একদিকে মহা মহা ভোগীর যেমন সৃষ্টি করিয়াছে তেমনি

অন্যান্য দেশেও সমান ভাবেই ঐ দুই রকম বীরের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন্ দিকে কাহার তুলা-দণ্ডটি যে কতখানি ঢলিয়াছে তাহা নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নয়।

আচ্ছা তবে আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা যে কথাগুলি বলিয়াছেন সে কি নিছক গাজাখুরি? না তাঁহাদের কোন রকম বাহিরের দৃষ্টি ছিল না? যাঁহারা শক্তি ও মনীষার এতখানি পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের যে এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটি ছিল না. পরের দেশ সম্বন্ধেও কিছুই জানিতেন না, নিজের দেশ সম্বন্ধেও তেমনি অন্ধ ছিলেন এ কথা মানিয়া লইতে একটা জোর জবরদস্তি করিতে হয়। আমাদের বোধ হয় আগেই বলিয়াছি তাঁহাদের ভাষা আমরা বুঝি না তাঁহারা যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন আমরা সে অর্থে ঠিক তাহাকে গ্রহণ করি না, আমরা দিতেছি সে শব্দের বর্ত্তমান যুগের অর্থ। তাঁহাদের অর্থ কি যে ছিল তাহা আবিষ্কার করা হয়ত খুবই কঠিন আমাদের মনে একটা অর্থ আসিয়াছে তাহা বলিতেছি সত্য কি না জানি না কাহাকে জোর করিয়া বিশ্বাস করিতেও বলি না।

আমাদের মনে হয়, কর্ম্ম ও ভোগ যে স্থূল অর্থে আমরা ব্যবহার করি, প্রাচীনদের উপরে উক্ত কথার মধ্যে ঐ দুটি শব্দের সে রকম স্থূল অর্থ নাই। কর্ম্ম অর্থ স্থূল অঙ্গ সঞ্চালন নয়, মাংশপেশীর মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে ধমনীর মধ্যে একটা আবেগ উত্তেজনা সাড়া নয়। কর্ম্ম

হইতেছে সেই শক্তি যাহা ঐ সব জিনিষের গোড়ার অন্তরালে রহিয়াছে, যাহা হইতে ঐ সকল জিনিষ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কর্ম্ম হইতেছে সেই নিবিড় তপঃশক্তি, অন্তরাত্মার একটা নিভৃত চাপ, অন্তর্যামী পুরুষের একটা ইচ্ছার বল—স ঐচ্ছৎ—যাহা কারণরূপে আছে বলিয়াই, বাহিরের ইন্দ্রিয় সব কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলতঃ আমরা এখন যে জিনিষকে কর্ম্ম বলি তাহা কর্ম্ম নয় তাহা হইতেছে কার্য্য। কর্ম্ম হইতেছে চিত্তের একটা বীজ শক্তি একটা সজাগ সংস্কার। আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনায় কর্ম্মক্ষয়ের যে ব্যবস্থা আছে তার লক্ষ্য স্থূল কার্য্য ততখানি নয় যতখানি এই চিত্তের কর্ম্ম-বীজ; আর ভোগ অর্থও বাহিরের স্থূল ভোগ ততখানি নয় যতখানি ভিতরের অন্তরাত্মার একটা রসের আস্বাদন, বীজাত্মক কর্ম্মশক্তি হইতে অঙ্কুরিত একটা বিশেষ পরিণাম বা ফলের, একটা আনন্দের ভোগ— তাহা সুখ হউক বা দুঃখ হউক— কোন বিশেষ ধারায় বিশেষ দিকে শক্তিকে চালিয়ে দিলে চাপ দিলে সে দিক হইতে বিশেষ একটা মূর্ত্তি লইয়া আসে যে প্রতিক্রিয়া।

এখন ভারত কর্ম্মভূমি, এ কথার অর্থ এই যে, চিত্তে নূতন কর্ম্মবীজ বপন করা, অন্তরাত্মায় শক্তির একটা নতুন উৎস খুলিয়া দেওয়া, স্বভাবের যে গতানুগতিক ধারা তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া ঘুরাইয়া নূতন মুখে চালান সম্ভব এই ভারতবর্ষে,—ভারতবাসী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে। কারণ ভারতবর্ষ হইতেছে যেন পৃথিবীর

অধ্যাত্ম পুরুষ, ভারতই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডার ; এখানেই সঞ্চিত হইয়া আছে, পৃথিবীর সকল ওলটপালটের মধ্যে এখানেই আশ্রয় লইয়াছে ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য, পরাজ্ঞানের সত্য সব। ভারতবাসী স্বভাবতই তাই সাত্ত্বিক প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির খেলায় সে ডুবিয়া মজিয়া যায় না, তাহার মধো আছে একটা স্থির ধীর একটা উদাসীনতা যাহার কৃপায় সে আপনাকে প্রকৃত লীলা হইতে আলাদা করিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে পারে এবং পারে বলিয়াই তাহার প্রকৃতিতে নূতন কর্ম্মশক্তি জন্ম লইতে পারে, অন্তর পুরুষকে নূতন উপলব্ধি দিয়া আবার নূতন একটা প্রেরণায় ভরিয়া দিয়া নূতন আধার তৈয়ারী করিয়াই নূতন পথে সে আবার চলিতে পারে। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির ধর্ম্ম আসে তাহার অন্তর পুরুষের দৃষ্টি হইতে। এই অন্তরপুরুষ যেখানে প্রকৃতি হইতে যত নির্লিপ্ত হইয়া আপনাকে রাখিয়াছে, ততই সে স্বাধীন ততই সে ইচ্ছামত প্রকৃতিকে গড়িয়া চালাইয়া লইতে পারে। কিন্তু তমঃ ও রজঃ গুণের আধিক্য-বশতঃ পুরুষ যেখানে প্রকৃতির আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে, মানুষ যেখানে আপনাহারা হইয়া, গীতার কথায় "প্রমত্ত" হইয়া, প্রকৃতির সাথে মিশিয়া গিয়াছে সেখানে প্রকৃতির অভ্যস্ত কর্ম্মশক্তির স্রোতেই সে চলিতে থাকে, সেখানে নূতন কর্ম্মবীজ উপ্ত হয় না, পুরাতন যে বীজ পড়িয়াছে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া, ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া বাড়িয়া উঠে।

ভারতবাসার সমষ্টিগত স্বভাবের ধাতে আছে আধ্যাত্মিক-নির্লিপ্ততা, এইটিই তাহার বিশেষত্ব। এই নির্লিপ্ততা, এই উদাসীন-ভাবের জন্যই সে কর্ম্ম স্রোত হইতে আপনাকে তুলিয়া অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে ও আবার সেখান হইতে নূতন কর্ম্মের ধারা সৃষ্টি করিতে পারে। এই ভারতবর্ষ তাই কর্ম্মভূমি। আর আর সব দেশের স্বভাবের ধাত এই যে তাহারা স্বভাবের আবর্ত্তে ছুটিয়া চলে. সেটাকেই ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরে কিন্তু স্বভাবের অতিরিক্ত হইয়া স্ব'এর মধ্যে আবার নূতন ভাব পত্তন করিতে তাহারা জানেনা। তাই আর আর দেশ কেবল ভোগভূমি। বহমান যে কর্ম্মের বেগ তাহা ফুরাইয়া আসিলে যদি নূতন রকম কর্ম্মশক্তি অর্জ্জন করিতে হয় তবে ভারতবর্ষে জন্মিয়া একটা সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইতে হইবে, পুনরায় অন্তরপুরুষের সাক্ষাৎ করিয়া তথা হইতে নূতন কর্ম্মভাণ্ডার লইয়া যথাক্ষেত্রে যাইতে হইবে। এ কথার অথ নয়, ভারতবর্ষেই কেবল অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও শক্তি সম্পন্ন লোক পাওয়া যায় কিম্বা ভারতবাসী মাত্রই ঐ ধরণের; আর অন্যান্য দেশে সবাই আপনহারা, প্রাকৃত স্বভাবের। এই তথ্যটি হইতেছে একটি মোটের উপর কথা, একটা দেশের বা জনসঙ্ঘের সমবেত চেতনার কথা। আমাদের প্রাচীনদের কাছে ভারতের ও অন্যান্য দেশের মানসী মূর্ত্তি এইরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই তথ্যটি কতদূর সত্য, আদৌ সত্য কিনা অথবা যে কথা

তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন তাহার অর্থ ঐ রকম কি না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে আমরা কাহাকে বলি না। আমরা প্রশ্ন তুলিয়া একটা মীমাংসা দিলাম, তাহা লইয়া গবেষনা চলিতে পারে। সে যাহাই হউক, আমাদের আসল কথা এই—গোটা ভারতের একটা সজীব সচেতন সত্তা প্রাচীনদের মনেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এই বস্তুটি আধুনিক যুগের বা ইউরোপের দান নয়। আমরা আধুনিকেরা ভারতের স্বাতন্ত্রকে একভাবে দেখিতে পারি, কিন্তু প্রাচীনেরাও যে একভাবে দেখিয়াছিলেন সেই কথাটা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাই মতের পার্থক্য থাক্‌লেও, এক মন নিয়ে তাঁদের সাথে আমরা সমস্বরে এ কথা যদিও না বলিতে পারি—

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গ হেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

অন্ততঃ পারি বলিতে—

জানীম নৈতৎ ক্ক বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলুতে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ॥

ভারতের উত্তম-রহস্য

"যা নাই ভারতে, তা নাই ভূভারতে।"* সত্যই ত—কারণ, ভারত ক্ষুদ্রতর ভূলোক, আর ভূলোক বৃহত্তর ভারত। ভারতের নামেই পৃথিবীর নাম—কারণ, সমগ্র পৃথিবীর প্রতীক হইতেছে আমাদের এই ভারতবর্ষ। ভূমণ্ডলের যেখানে যাহা কিছু আছে, মানুষ যেখানে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার গোড়ার প্রতিরূপ আছে ভারতবর্ষে; আর ভারতে যে জিনিষের মূল্য নাই,

* কথাটির যে আসল অর্থ তাহার পরিবর্ত্তে একটা প্রচলিত যে অর্থ তাহাই অনুসরণ করিয়াছি। অন্ততঃ অলঙ্কারের খাতিরে আমার এ ব্যাখ্যা মার্জ্জনীয়—লেখক।

২

ভারতের দৃষ্টি যে ধরণের জিনিষ কল্পনাতেও দেখিতে পারে নাই, ভূমণ্ডলের অন্যত্র কোথাও তাহা মিলিবে না।

ভারতের প্রাকৃতিক রূপই এই কথার প্রমাণ দিতেছে। একদিকে অভ্রভেদী চিরতুষারমণ্ডিত গিরিরাজ অচলপ্রতিষ্ঠ, আর একদিকে অসীম-বিস্তৃত মহাসাগর চিরচঞ্চল। ভারতের বুকে রহিয়াছে গহন গভীর বিরাট অরণ্যাণী, আবার ঊষর ধূসর ধূ ধূ মরুভূমি। গর্ভে তাহার স্বর্ণ ও অঙ্গার মাখামাখি হইয়া আছে। একদিকে দারুণ হিম, শৈত্য, কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা; অপর দিকে তেমনি ভীষণ গ্রীষ্ম, উত্তাপ, খর রৌদ্র, খাঁ-খাঁ দিগন্তর। প্রাবৃটের পুঞ্জীকৃত তমোঘন মেঘসম্ভার, আকাশ ভাঙ্গিয়া তুমুল বন্যার অবতরণ, তারপরেই শরতের স্নিগ্ধ সুনীল নির্ম্মল আকাশ। ফলফুল, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু আকারে ও প্রকারে যে কত বিচিত্র তাহার ইয়ত্তা নাই—বর্ণ-গন্ধ-রস ছন্দ-রূপ-গুণ ভারত সৃষ্টি করিয়াছে অজস্র অফুরন্ত।

ভারতের মানুষই বা কত রকমারি—চেহারা হিসাবে, জাতি হিসাবে, ধাতু হিসাবে, শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে। মসীকৃষ্ণ পারিয়া হইতে কষিতকাঞ্চন কাশ্মীরী, শালপ্রাংশু কবাটবক্ষ পাঞ্জাবী হইতে জীর্ণ শীর্ণ গৌড়বাসী যথেচ্ছ মিলিবে ভারতে। বাঙ্গালী হইতেছে কবি শিল্পী, মহারাষ্ট্র কূটরাজনীতিজ্ঞ, মান্দ্রাজ সূক্ষ্মতার্কিক, পঞ্চনদ যোদ্ধা। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষারও প্রায় প্রতিরূপ রহিয়াছে

ভারতে। তাই ত বলা হয়, বাংলা হইতেছে ভারতের ফরাসী, তেলেগু হইতেছে ভারতের ইতালীয়, তামিল ভারতের জর্ম্মন ভাষা। গ্রীকের সৌন্দর্য্য, লাতিনের সামর্থ্য মিলাইয়া সংস্কৃত। আর্য্য, অনার্য্য, নিগ্রো মঙ্গোলীয় সকল রকম জাতির ভাষা, সকল রকম জাতির রক্ত ভারতে রহিয়াছে বীজরূপে। ভারতেই থরে থরে সজ্জিত আছে আদিম অসভ্যদের ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে আর্য্যসভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

ভারতের সমাজগঠনের ধারাও কত বহুবিচিত্র। বলা হয়, জাতিভেদেই ভারতীয় সমাজের বিশেষত্ব। খ্রীষ্টান, মুসলমানের কথা ছাড়িয়া দিলাম—যদিও তাহাদিগকে ভারত আপনার অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইয়াছে; হিন্দু সমাজের মধ্যেও এমন সম্প্রদায়ের অভাব নাই যেখানে বর্ণগত বৈষম্য লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "আর্য্য সমাজ", "ব্রাহ্ম সমাজ", "বৈষ্ণব সমাজ" ইউরোপীয় সমাজের অপেক্ষা কম সাম্য দেখাইতেছে না। গোঁড়া হিন্দুরাও সময়ে বর্ণ বৈষম্য একেবারে বিসর্জ্জন দিতে দৃকপাত করে নাই—শ্রীক্ষেত্রে সব একাকার। সমাজের কর্ত্তা সাধাবণতঃ পুরুষ; কিন্তু সমাজের কর্ত্তা অর্থাৎ কর্ত্রী যে নারী, এ ব্যবস্থাও ভারতে আছে—পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) ও মাতৃতন্ত্র (Matriarchy), এই দুই রকম সমাজই ভারতে আছে—প্রমাণ কেরল প্রদেশ। এমন কি আধুনিক "কমিউনিজম" (Communism) বা সঙ্ঘবাদ ও ভারতে একান্ত অপরিচিত নয়।

রাষ্ট্রনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি—ঐতিহাসিকেরা একথার প্রমাণ দিবেন যে, একদিকে ভারত যেমন স্থাপন করিয়াছে রাজতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি গণতন্ত্রও তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সাম্রাজ্য বা রাজচক্রবর্ত্তীত্ব সে একদিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অন্যদিকে আবার জনসাধারণের কর্ত্তৃত্বও অটুট রাখিয়াছে। রাজা "নর-দেবতা", আবার রাজা "গণদাস", এই দুই কথাই ভারত একমুখে বলিয়াছে, একদিকে মৌর্য্যদের, গুপ্তদের "এম্পায়ার" (Empire) আর একদিকে শাক্য, মল্ল, লিচ্ছবী প্রভৃতির "রিপবলিক" (Republic)—রাষ্ট্রশাসনের সকল রকম ব্যবস্থাই ভারত যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।

ধর্ম্মের আদর্শের দিকে দেখ। কত সম্প্রদায়, কত সাধন পথ, কত সিদ্ধান্ত ভারত গড়িয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে যাহারা আসিয়াছে—আপাততঃ দেখিতে তাহা যতই ভিন্ন ও বিজাতীয় বোধ হউক না কেন, সকলকে কত সহজেই ভারত আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে—কারণ, ভারতের নিজের ভিতরেই ছিল এই উদার বৈচিত্র্য। একদিকে সে যেমন জোর করিয়া বলিয়াছে যাহা কিছু আছে সব ঝুটা, কিছুই নাই, সব শূন্য, সুতরাং কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ; অন্যদিকে তেমনি অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিয়াছে যাহা আছে তাহাই আছে, স্থূল চক্ষুতে যাহা দেখিতেছ তাহাই সব—সুতরাং, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। এই ভারতই ক্ষত্রিয়বলকে

ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে 'বলং বলং ব্রহ্মবলং', করুণা-মৈত্রী-অহিংসা প্রচার করিয়া বলিয়াছে শত্রুকে কখন শত্রুভাব দিয়া জয় করা যায় না—"ন হি বেরেণ বেরাণি সমন্তীধ কদাচন"; আবার এই ভারতই শিক্ষা দিয়াছে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ', 'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব পরন্তপ।' ভারতের সাধককেই একদিকে বলিতে দেখি, আমি অধম, আমি অক্ষম, আমি দীনহীন পাপী; আবার ভারতেই দেখি সাধক বলিতেছে, আমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, 'সচ্চিদানন্দরূপো শিবোঽহং', "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি।"*

ভারত সারা পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মই যেন আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। শুধু তাই নয়, ভারত আপনার ভিতর হইতে যাহা সৃষ্টি করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে, সারা পৃথিবী তাহাই গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া উঠিয়াছে। ভারত কি ভাবে ভূমণ্ডলের শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহার প্রমাণ ইতিহাসই দিতেছে —সে প্রমাণের নিত্যনূতন রূপ আজও আবিষ্কৃত হইতেছে। ইউরোপ আজ শিক্ষায় সভ্যতায় জগতের রাজা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই ইউরোপের পিছনে রহিয়াছে রোমের গ্রীকের প্রতিভা, গ্রীকের

* অন্যান্য দেশেও এই রকম বিভিন্ন বিরোধী মতবাদ যে একান্ত দেখা যায় না, তাহা নয়। কিন্তু এত রকম মতবাদের প্রত্যেকটিকে জীবনে চরম করিয়া ফলাইয়া জাগ্রত করিয়া ধরিবার এমন প্রয়াস ভারত ছাড়া অন্যত্র দেখিতে পাইনা।

পিছনে ক্রীটের মিশরের প্রতিভা, মিশরের পিছনে সাক্ষাৎভাবে এবং সুমের, আকাদ, ব্যবিলন, আসিরিয়া, প্রাচীন পারস্যের পিছনে অসাক্ষাতে দাঁড়াইয়া আছে ভারত। সুদূর অতীতে ভারত যে পশ্চিম দিকেই আপনার হাতখানি প্রসারিত করিয়াছে তাহা নয়, পূর্ব্বেও অপার জলধি পার হইয়া আমেরিকায় পর্য্যন্ত তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমেরিকায়, মেক্সিকোদেশে পাওয়া গিয়াছে হিন্দুর দেবদেবী মূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি। এই বৌদ্ধযুগে—এবং তাহার বহু পূর্ব্বেও যে না হইতে পারে এমন নয়, প্রমাণ যদিও আমরা পাইয়াছি কেবল বৌদ্ধযুগের—আর এক ঢেউ ভারত হইতে উঠিয়া পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—মধ্যএসিয়া, চীন, জাপান, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা (আনাম), যবদ্বীপ শিক্ষাদীক্ষায় ভারতের উপনিবেশ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তারপর যে খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপকে এতখানি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে কতখানি হিন্দুর ভারতের প্রতিভা সে রহস্য আজও সম্যক তলাইয়া দেখা হয় নাই। আজও ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে যে একটা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল চর্চ্চা দেখা দিয়াছিল তাহারও গোড়ার প্রেরণা মুসলমানেরা লইয়া গিয়াছিল ভারতের শিক্ষাদীক্ষা হইতেই। তারপর আবার এই ভারতকেই আবিষ্কার করিবার জন্য কলম্বস্, ভাস্কোডিগামা বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—কেন? ভারতের সম্পদের লোভে? আসল গুপ্ত কারণ, সূক্ষ্ম জগতের কারণ, ইউরোপের চেতনায় সাড়া

দিয়াছিল একটা আকাঙ্খা ভারতের কল্যাণস্পর্শ পাইতে, ইউরোপেরও আপনার যে প্রাণের প্রাণ তাহার সন্ধান লইতে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ শারীর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে। সজ্ঞানে না বুঝিলেও, অন্তরাত্মার একটা আধ্যাত্মিক অভাব ও ব্যাকুলতার বশেই অর্থের সাথে সাথে পরমার্থের লোভেই ইউরোপ তখন ভারতের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু এত অতীতেই বা যাইতে হইবে কেন? গ্রীক শিক্ষা-দীক্ষার পুনরাবিষ্কারের ফলে বলা হয় ইউরোপের হইয়াছিল একটা পুনর্জন্ম—রেনাসেন্স। কিন্তু ইউরোপের সভ্যতার গভীরতর পুনর্জন্ম হইয়াছে ইউরোপ যেদিন আবিষ্কার করিল সংস্কৃত সাহিত্য—বেদ উপনিষদ। আর ইহা ত সেদিনের কথা, যেদিন ভারতের সন্ন্যাসীবীর বেদান্তের বার্ত্তা লইয়া সিংহগর্জ্জনে পাশ্চাত্যের বুকের উপর যাইয়া পড়িলেন। বিবেকানন্দ ভারতের যে দীপ্ত প্রতিভা ইউরোপের জীবনের সম্মুখে জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন তাহার কার্য্য আজও সমাপ্ত হয় নাই।

ভারত তবে কি? ভারত ভূখণ্ড-বিশেষ শুধু নহে, অন্যান্য দেশ সকলের মধ্যে একটা দেশ মাত্র নহে। অন্তরের সূক্ষ্মতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে, আমরা বলিতে চাই, ভারত হইতেছে ভূভারতের মানবজাতির "কারণ পুরুষ।" তন্ত্রে কারণ-জগতের কথা বলিয়াছে, উপনিষদে তাহাকেই নাম দিয়াছে বিজ্ঞানলোক, পুরাণ অনুসারে

তাহাই মহর্লোক। কারণ-জগৎ হইতেছে যেখানে সৃষ্টির আদিরূপ, বস্তুর প্রথম বীজ। স্থূলে যাহা কিছু প্রকাশ পাইবে বা প্রকাশ পাইতে পারে, তাহাদের সাধারণ মূলতত্ত্বগুলি যেখানে চিন্ময়মূর্ত্তিতে আবির্ভূত তাহাই বিজ্ঞানলোক। ইহাকেই মহর্লোক বলে, এই জন্য, এখানকার তত্ত্ববস্তুগুলি অন্তরের প্রকাশ, এখানকার রূপায়ন বিশিষ্ট হইলেও খণ্ড ও সীমাবদ্ধ নহে, তাহাতে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে বৃহতের স্বভাব ও স্বরূপ। অনন্তের অসীমের অনির্দ্দেশ্যের মধ্যে যখন সৃষ্টির প্রকাশের আবেগ প্রথম চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সেখানে দেখা দেয় যেন কতকগুলি ঘূর্ণিপাকের কেন্দ্র, তপঃ-তেজের উৎস—অবাঙ্‌মনসো-গোচর, যাহা তাহা কতকগুলি মূল ভাবরসকে আশ্রয় করিয়া গোচর হইতে থাকে, ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই সকল মূলভাব আবার বহুবিচিত্র নানাবিধ সম্ভাবনার ধারা বিকীর্ণ করিয়া সূক্ষ্মজগতের সৃষ্টি করে। এবং পরে এই সম্ভাবনার ধারার কতকগুলি আরও স্পষ্ট, আরও মূর্ত্ত, আরও জমাট হইতে হইতে পরিণত হয় এই স্থূল দৃশ্যমান জগতে। ভগবানের অন্তরে সৃষ্টির যে মূল সূত্রগুলি, যে প্রথম কাঠাম বা নক্সা, তাহাই হইতেছে কারণ-জগৎ, সেখানেই বস্তুর স্বরূপ ও স্বভাব; কারণ-জগতে বস্তুর এই স্বরূপ ও স্বভাবকেই প্লেতো (Plato) নাম দিয়াছেন "আইডিয়া" (Idea)।

এই "আইডিয়া" রাজী লইয়া যে দিব্যলোক তাহার প্রতীক

হইতেছে ভারত। ভারত যেন ভগবানের কর্ম্মশালা—এখানেই তিনি পরীক্ষা করিতেছেন, গড়িয়া তুলিতেছেন যে সব মূলভাব, বীজশক্তি, পরে জগতের উপর ছড়াইয়া পড়িবে, মানবজাতির সকল সৃষ্টির কারণ হইবে। ভারতই যেন দেবধাম—এখানেই সৃষ্টির নিয়ন্তা, বাস্তবের অধিষ্ঠাতা যে সব অমরবৃন্দ তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিতেছেন, ব্রহ্মসত্তা হইতে প্রথম প্রকাশের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন—এইখান হইতেই তাঁহারা একে একে পরে জাগ্রত রূপ ধরিয়া পৃথিবীর এক এক দিকের অধিপতি হইয়া চলিয়াছেন। সৃষ্টিচক্রের যে নাভি তাহাই ভারত।

ভারত মহর্লোকস্থ চিন্ময় ভাবাবলীর বিগ্রহ। ভারতের সকল প্রকাশের মধ্যে তাই রহিয়াছে দেখি অনন্তের অসীমের চেতনা। ভারত যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই মধ্যে আছে কেমন একটা বিশাল পরাকাষ্ঠা। মাঝ পথে কোন জিনিষকে সে ছাড়িয়া দেয় নাই। কোন জিনিষকে খাট করিয়া ক্ষুদ্র আকার দিয়া গড়ে নাই—প্রত্যেক চূড়ান্তে বৃহতে সে পৌছিতে চাহিয়াছে। গ্রীক্ খুঁজিয়াছে পরিমান—golden mean—কিন্তু অসীমের বোধ ভারতকে চালাইয়া লইয়াছে সকল সীমার বাহিরে—অত্যন্তের, অত্যধিকের দিকে—শেষে পৌঁছিয়াও ভারত জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ততঃকিম্? আর এই বিরাট বিপুলতার বোধ এত জাগ্রত ছিল বলিয়াই ভারত কোন একটি সত্যের ধারাকে একান্ত করিয়া জড়াইয়া

ধরিতে পারে নাই। সত্য মূলতঃ এক হইলেও তাহার প্রকাশ বহু—তাই ত সে বলিয়াছে, বহুধা বদন্তি। ভারতের জীবনতন্ত্রীতে তাই একটি সুরই বাজে নাই,—বহুত্বের বৈচিত্র তাহার মধ্যে ঝঙ্কত করিয়া তুলিয়াছে একটা বৃহৎ সঙ্গত। কারণ-পুরুষ এই রকমেই অনন্তের বোধকে অটুট রাখিয়া তাহারই মধ্যে ফুটাইয়া ধরিয়াছে সান্তের লীলা। মহর্লোকে সৃষ্টির যে বীজলীলা তাহাতে অনন্তের ও সান্তের, অরূপের ও রূপের পূর্ণ মিলন ও সামঞ্জস্য। স্থূলে জড়-প্রতিষ্ঠানে যখন সৃষ্টির বেগ বাঁধা পড়িয়াছে তখনই যেখানে অনন্তের বোধ লোপ পাইয়াছে বস্তু সেখানে আপন স্পষ্ট নিরেট ব্যক্তিগত রূপের মধ্যে নিঃশেষে ধরা দিয়াছে। ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশের সৃষ্টিতে পাই নাকি এই রকম একটা সীমার বাঁধন, রূপের আয়তনে একটা পরিণামের সমাপ্তির গণ্ডী? পরন্তু ভারতের সকল দেহ-চেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে বিদেহের ব্যঞ্জনা,—স্থূল সত্য, বাস্তব প্রতিষ্ঠানের পিছনে তাহার দৃষ্টিতে অধিকতর জাগ্রত তাত্ত্বিক বস্তু, আত্মিক সত্তা।

অন্ন ব্রহ্ম

যে ভারতবর্ষ একদিন শুধু আত্মাকে লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিল, আজ সে অন্ন লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মাই একমাত্র সত্য, আত্মাকেই জান, আর সকল কথা ছাড়িয়া দাও—একদিন বুক ফুলাইয়া সে এই মন্ত্র প্রচার করিতে দৃক্‌পাত করে নাই ; আজ কিন্তু দেখিতেছি সব ভুলিয়া সে 'কোথায় অন্ন' 'কোথায় অন্ন' করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। উপবাসের, কৃচ্ছ্র সাধনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে এক দিন আমাদের কোনই কষ্ট হয় নাই ; আজ কিন্তু সেই দগ্ধোদরের পূর্ত্তিই হইয়া উঠিয়াছে আমাদের চতুর্ব্বর্গ। কি অধঃপতন, নয় কি ? সে গৌরবের আধ্যাত্মিকতার দিন চলিয়া

গিয়াছে, আমরা হইয়া পড়িয়াছি ঘোর জড়বাদী। O tempora, O mores; হায়রে, তে হি নো দিবসা গতাঃ —

কিন্তু কেন এমন হইল? বাস্তবিকই কি ইহা অধঃপতন? এই অধঃপতনের অন্তরে কি উর্দ্ধে আরোহণের কোন ইঙ্গিত নাই? দেশে আমাদের আধ্যাত্মিকতার দিনে প্রচুর অন্নসংস্থান ছিল কিনা, আজ সে অন্নের তিরোধান হইতেছে কিনা বা কি রকমে হইতেছে— এই সব প্রশ্ন আমরা তুলিব না, অর্থতত্ত্বের দিক হইতে আমরা কোন সমস্যা তুলিতেছি না। তুলিতেছি আমাদের মনস্তত্ত্বের—আধ্যাত্মেরই দিক হইতে।

আত্মাকে ছাড়িয়া আজ যে আমরা অন্নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছি, ইহার আর সব কারণ যাহাই হউক, ইহার মূল— আধ্যাত্মিক কারণ এই যে, একদিন অন্নকে ছাড়িয়া আমরা আত্মারই দিকে অতিমাত্র ঝুকিয়া পড়িয়াছিলাম, ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ—ক্ষতিপূরণের দাবী। পাশ্চাত্যের এক মনীষি এমার্সন— এই তথ্যটির বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাঁহার কথাতেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। মানুষ উন্নতির বা বিবর্ত্তনের পথে চলিতে চলিতে যদি কোন সত্যকে ডিঙ্গাইয়া অগ্রসর হইয়া যায়, তবে তাহাকে ফিরিয়া সেই পরিত্যক্ত সত্যটি কুড়াইয়া লইয়া আবার চলিতে হয়—ইতিহাসে ইহারই নাম দেয় বিপ্লব (Revolution)। প্রকৃতিকে কেহ ফাঁকি দিতে পারে

না, তাহার প্রতি স্তরের সত্যকে মানিয়া হজম করিয়া তবে উপরে উঠা দরকার, নতুবা এই উপরে উঠা কোন রকমেই পাকা বা স্থায়ী হয় না। ভারতবর্ষ আজ এই কথাটিকেই প্রমাণিত করিতেছে। অন্নকে প্রেয় বলিয়া সে হেয় জ্ঞান করিয়াছিল, একদিন নিম্ন বা অধম স্তরের সত্য বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, সে ছুটিয়া গিয়াছিল আত্মার স্বরূপের দিকে, তাই আজ তাহাকে ফিরিয়াআবার অন্নের ব্রহ্মত্বকে স্বীকার করিতে হইতেছে। 'নৈদং যৎ উপাসতে'—সত্য কথা; কিন্তু ফিরিয়া ঐ জ্ঞান লইয়াই যখন আবার বলিতে পারিবে 'ইদং যৎ উপাসতে'—'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং', তখনই হইতেছে পূর্ণজ্ঞান।

অন্নও ব্রহ্ম—এ শুধু পশুর উপলব্ধি নহে, ইহা দেবতারও উপলব্ধি, ইহা আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষেরও মুখে শোভা পাইতে পারে। অন্নের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন নিগূঢ় ভাবে, সর্ব্বভূতে যেমন সেই রকম অন্নেরও অন্তরে আছেন সৎ-চিৎ-আনন্দ—এই হিসাবে নয়; সাধারণ ভাবে অন্নেও ব্রহ্মপুরুষ অধিষ্ঠান করিতেছেন, ভারতবর্ষ এ কথা অবশ্য কখনও অস্বীকার করে নাই, দোষ তবে এই যে শুধু এই কথাটিকেই সে অতিরিক্ত জোর দিয়া বলিয়াছে; যে কথাটি তাহার প্রাণে প্রাণে লাগে নাই তাহা এই যে, অন্নের যে বিশেষ রূপ, তাহার যে পার্থিব রস, সেটিও পরমার্থ তাহাও ব্রহ্ম। অন্নের অভ্যন্তরে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি অর্দ্ধেক সত্যের উপলব্ধি, পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি হইতেছে তখন যখন অন্নের ব্যবহারিক মূর্ত্তিকে বাদ দিয়া নয়, বিলোপ

করিয়া নয়, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া তাহার সবখানি তাহার অন্তর বাহিরকে ব্রহ্মত্বে মণ্ডিত করিতে পারি।

সুপ্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মদৃষ্টি স্বরূপ ছিল যে উপনিষদ তাহা এক দিন এই ভাবেরই একটা কথা বলিয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহে দারুণ কষ্টে ব্রহ্মচর্য্যসাধন করিয়া, সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন; পিতার নিকট আসিয়া অবশিষ্ট ব্রহ্মত্বেরও শিক্ষা করিলেন। এক দিন আরুণি শ্বেতকেতুকে পরীক্ষা করিবার জন্য—অথবা হয়ত তাহকে চরম শিক্ষাটি দিবার জন্যই ডাকিয়া বলিলেন, "শ্বেতকেতু, পঞ্চদশ দিন অভুক্ত থাকিয়া ষোড়শ দিনে আমার নিকট আসিও"। শ্বেতকেতু তাহাই করিল, অভুক্ত অবস্থায় ষোড়শ দিনে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। আরুণি শ্বেত-কেতুকে তখন ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের কথা বলিতে বলিলেন। শ্বেত-কেতু উত্তর করিল, "আমার সে সব কিছুই মনে পড়ে না।" আরুণি তখন শ্বেতকেতুকে খাইয়া আসিতে বলিলেন, আহারের পর শ্বেত-কেতুকে যাহাই জিজ্ঞাসা করা হউক না কেন, সে তৎসমস্তেরই যথাযথ উত্তর দিল। আরুণি তখন বলিলেন, "শ্বেতকেতু! পুরুষের আছে ষোলটি কলা; পনর দিন তুমি অনাহারে ছিলে, তাই একে একে সেই ষোল কলার পনরটি তোমার লোপ পাইয়াছিল। ইন্ধনের অভাবে প্রজ্বলিত অগ্নি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যখন খদ্যোতের মত হইয়া পড়ে, তখন সেই অগ্নি সব কিছু জিনিষ দগ্ধ করিতে পারে না,

খদ্যোতের অনুরূপই হয় তাহার শক্তি ; আবার ইন্ধন পাইলে সেই খদ্যোতপ্রায় অঙ্গার সর্ব্বশক্তিমান হুতাশন হইয়া উঠে। তোমারও ঠিক তাহাই হইয়াছে ; ভোজনের পর লুপ্ত পনরটি কলা তোমার আবার প্রকাশিত হইয়াছে, তাই তোমার স্মৃতিতে সব ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং মনে রাখিও, এই সমস্ত আধার অন্ন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, অন্নই ইহার মূল—অশনায়েতি তত্রৈতৎ শুঙ্গমুৎপতিতং সৌম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি, তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাৎ। ইহারই উপর ভর করিয়া, ইহারই প্রতিষ্ঠায় প্রাণে তেজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, জাগ্রত সজীব করিতে হইবে তোমার ব্রহ্মত্বকে—এবমেব খলু সৌম্যান্নেন শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছদদ্ভিঃ সৌম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সৌম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ। এইরূপে যখন সৎপদার্থ পাইবে তখনই যথার্থতঃ বুঝিবে সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। অন্নকে বাতিল করিতে, নাকচ করিতে হইবে না, অন্নকে সৎপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে, সৎপ্রতিষ্ঠ হইয়া অন্নকে ভোগ, করিবে, সৎএর সত্বায় অন্নকে রূপান্তরিত করিবে। 'আমি নিরপরাধী'—ইহাই সত্য বলিয়া যাহার অন্তরাত্মা জানে, সে এই সত্যাভিসন্ধের বলে তপ্ত পরশু হাতে লইয়াও অক্ষত থাকে, ও অভিযোগ হইতে মুক্ত হয় ; সেই রকম সৎপ্রতিষ্ঠ পুরুষও অন্নকে, প্রাণকে, মনকে লইয়া খেলিতে পারে, ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হয়।" আরুণির এই উপদেশ আমরা

উপনিষদের অন্যত্রও বহু পাই। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" সৎবস্তু যাহা ছাড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছে, আপনার ভিতর হইতে বাহিরে সৃষ্টি করিয়াছে,— ভগবানের প্রদত্ত ভগবৎসত্ত্বায় মণ্ডিত করিয়া পাই আমরা যে অন্ন তাহা ভোগ করিতে হইবে। এই কথারই সমর্থন করিয়া গীতা বলিতেছেন—"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব-কিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥" ভোগ বা কর্ম্ম যে বন্ধনেরই হেতু হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। বরং ভোগের কর্ম্মের দ্বারাই ব্রহ্ম উপচীত হয়—শ্বেতকেতুর যেমন হইয়াছিল। তাই খ্যাতনামা গো লোভী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মজ্ঞানেও কিছু ময়লা ধরে নাই। তাই শুনি উপনিষদ বলিতেছেন অতীবাদী হইও না, একদিকের সত্যকে—আত্মাকেই একান্ত করিয়া ধরিও না, জানিও আবার প্রাণকে ; আত্মরত হও, কিন্তু সে আত্মায় আত্মায় রমণ প্রাণের মধ্যে দেহের মধ্যে—কর্ম্মে ভোগে ফুটাইয়া ধর। এইটি যদি করিতে পার তবে তুমি শুধু ব্রহ্মবিৎ হইবে না, তুমি হইবে ব্রহ্মবিৎদিগেরও মধ্যে শ্রেষ্ঠ—

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈ বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

পশু বা একান্ত যে জড়বাদী তাহার অভাব এইখানে—সে

অতিবাদী। প্রকৃত পক্ষে সে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, সে জানে অন্নকে অন্ন বলিয়াই, উদরপূর্ত্তির উপকরণ বলিয়া, আর এই অন্নময় অন্ন ছাড়া আর কিছু যে আছে বা থাকিতে পারে তাহাও তাহার বোধে বা বুদ্ধিতে আসে না। আমরাও এক দিন জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক আত্মা ছাড়া আর কিছুকে জানি নাই, পাই নাই; আমরাও জড়বাদীরই মত অন্নকে শুধু অন্নময়, উদরপূর্ত্তির উপকরণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। জড়বাদীরই মত আমরা বুঝি নাই 'অন্নময় অন্ন ছাড়া আছে আর এক অন্ন, অন্নেরও আছে ব্রহ্মতেজ। তাই ব্রহ্মতেজকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে, তেজ খসিয়া পড়িয়া, রহিল নিগু'ণ নিষ্ক্রীয় ব্রহ্ম, সে ব্রহ্মও ক্রমে নির্ব্বাণ ও লয়ে মিশিয়া গেল। উপনিষদ যে 'তেজব্রহ্মে'র কথা বলিয়াছেন, তাহা হইয়া পড়িল তমোব্রহ্ম—এই তমোব্রহ্মেরই রূপ হইতেছে যাহা নিছক জড় বা অন্ন। অন্নকে বাদ দিয়াছিলাম, তাহাকে সমুন্নত রূপান্তর করিতে পারি নাই, তাই ফিরিয়া আজ সেই অন্নেরই মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

ব্রহ্মকে লইয়া—আর সব বর্জ্জন করিয়া আমরা একদিন শুধু ব্রাহ্মণই হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিলাম; তাই আমরা আজ সকলে একেবারে শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু ব্রহ্মের যে আছে চারিটি অঙ্গ বা স্তর—সোহয়ং চতুষ্পাদ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই ধর্ম্ম বা শক্তি চতুষ্টয় মিলিয়াই পূর্ণব্রহ্ম। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন

আমাদের সামাজিক জীবনকে যদি পূর্ণব্রহ্মের আধার করিয়া তুলিতে হয়, তবে ব্রহ্মের এই চারিটি ভাবকেই গ্রহণ ও ধারণ করিতে হইবে। শুধু জ্ঞানের পরিচর্য্যা করিলেই চলিবে না, আমাদের দেখাইতে হইবে কর্ম্মে শক্তি, উৎপাদন-প্রাচুর্য্য ও কৌশল. ব্যবহারে ভোগে অক্লান্ত সামর্থ্য। জাতির অধ্যাত্মজীবনের সাথে চাই রাষ্ট্রশক্তি (political life) , অর্থ-সম্পদ (economic life) , আর সুস্থ সবল স্থূলজীবন (physical life) ; এই ত্রয়ীর মধ্যেই অধ্যাত্মকে বিকশিত জাগ্রত করিয়া ধরিতে হইবে। এই চারিটির সম্মিলনেই পূর্ণজীবন, অর্থাৎ পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন।

যে অধঃপতন আমরা আজ আমাদের মধ্যে দেখিতেছি, যে অন্নবাদ আমাদের জীবনকে অন্তরবাহিরকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই, ভিতরে ভিতরে তাহা হইতেছে একটা পূর্ব্বসামঞ্জস্যের চেষ্টা, একটা মহত্তর আধ্যাত্মিকতায় উঠিবার প্রয়াস। দেশ যে আজ রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ঐহিক, লৌকিক আন্দোলনের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে, এক অন্ন-সমস্যারই তাড়নায় অধ্যাত্ম সমস্যাদি পিছনে লুকাইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে অধ্যাত্ম-সাধকের ভয় করিবার কিছু নাই। এই ব্যাপারের মূল কারণ, ইহার নিগূঢ় অর্থ আমরা যেমন বুঝি, তাহা হইতেছে দেহের মধ্যে তুরীয়ের, অন্নের মধ্যে অধ্যাত্মের আবির্ভাব-প্রয়াস। অধ্যাত্মের

মধ্যে একটা চাপ, একটা নূতন প্রেরণা, অভিনব সৃষ্টিস্পন্দন ব্যবহারে লৌকিকের স্তরে দেখা দিয়াছে অন্নসমস্যারূপে। শূদ্রধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম আর ক্ষাত্রধর্ম্ম, মানুষের দেহ প্রাণ মন (ঋষি আরুণি কথিত ত্রিবৃৎ, সৎ-এর ত্রিধা ভিন্ন বিকাশ—ক্ষিতি, অপ, তেজ) এতদিন আমাদের ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম, আমাদের আত্মার সৎপুরুষের কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। তাই ইহারা গোপনে গোপনে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বিপুল বেগে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদিগকে হয়ত অনেকখানি দমন বা সংযত করিতে হইবে অথবা আরও ঠিক-ভাবে বলিতে গেলে, ইহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু দমন সংযম বা শোধন অর্থে নিগ্রহ বা বর্জ্জন নহে। চর্চ্চা করিতে করিতে, বিকশিত করিতে করিতেই ইহাদের রূপান্তর করিতে হইবে। ভারতের পক্ষে সে রূপান্তর খুব কঠিন হইবে না বোধ হয় তাহা আপনা হইতেই অনেকখানি হইবে ও হইতেছে। কারণ, যে জিনিষটি একবার আমরা অন্তরাত্মায় প্রাণে অনুভব উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা সাময়িক কোন কারণে ভুলিয়া গেলেও অতি সহজেই ফিরিয়া জাগিয়া উঠে। একবার যে-বিদ্যা অধিগত করিয়াছি, আর একটি বিদ্যা শিখিবার জন্য তাহাকে কিছু দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিলেও তাহা হারায় না, সামান্য চেষ্টাতেই তাহা আবার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে। অধ্যাত্ম-বিদ্যা ভারতের প্রাণের অতি আপনার বস্তু, অন্নবিদ্যাকে

কুড়াইয়া লইবার জন্য সেটিকে ফেলিয়া যদি কখন কিছু পশ্চাতে সে হটিয়া আসে তবে সেই অধ্যাত্মপ্রেরণারই বলে সে অন্নকে লইয়া আবার অধ্যাত্মে ফিরিয়া আসিবে—"পূর্ব্বভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ"। তাই ত শ্রীভগবান আশ্বাস দিয়াছেন—

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশ স্তস্য বিদ্যতে।" ৬।৪০।

কিন্তু শুধু ইহাই নয়। মানুষকে যতখানি অন্নগত জড়বাদী বলিয়া আমরা মনে করিতে চাই, বাস্তবিক সে ততখানি নয়। প্রকৃতির বিবর্ত্তনের আবেগে, অন্তঃপুরুষের ইষণার বলে সে ঘুরিয়া হউক ফিরিয়া হউক ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে, আত্মাকে ব্রহ্মকে খুঁজিতে চলিয়াছে, আত্মার ব্রহ্মের দ্বারাই আপনার সত্তাকে সমস্ত জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। ভারতের আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনের ধরণটী আমরা কিছু বলিয়াছি, এইসঙ্গে ইউরোপের ধরণটীও উল্লেখ করিয়া উভয়ের তুলনা করিতে চাই। ইউ-রোপের প্রাণ চিরকালই অন্নপ্রধান, ইউরোপের ঝোঁক বাহিরের ভৌতিক প্রতিষ্ঠানের দিকে, এ কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করিবেন। ইউরোপে তাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না, সেখানে পাই বিপুল পরিমাণে লৌকিকজ্ঞানের—রাজনীতির, সমাজনীতির, অর্থনীতির কথা। ইউরোপের প্রাণে জীবনে, তাহার প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তি যতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যতখানি ছড়াইয়া আঁকড়িয়া আছে, ব্রাহ্মণশক্তি তেমন

কিছুই করে নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইউরোপ যে ব্রহ্মের অধ্যাত্মের পথে চলিতেছে না, এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। ইউরোপের সাধনধারা, ভারতের সাধনধারা হইতে বিভিন্ন মাত্র। ভারতবর্ষে কেমন করিয়া জানি না একটা জন্মসিদ্ধ সহজ দৃষ্টি, দিব্য প্রেরণার বলে অথবা বহুপ্রাচীন কোন যুগযুগব্যাপী সাধনার ফলে কিম্বা ভগবৎ প্রসাদে, একেবারে চরম জ্ঞানে উঠিয়া গিয়াছিল, পাইয়াছিল ইন্দ্রিয়গ্রামের অতীত, সৃষ্টির অতীত সেই সৎপ্রতিষ্ঠা, সেই সদায়তন ; সেখান হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নীচের প্রতি স্তর ক্রমে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে, সৎএর মধ্যে শক্তির লীলা ফুটাইয়া ধরিতে। আগে তাহার বেদান্তসাধনা, পরে তাহার তন্ত্রসাধনা। ইউরোপ কিন্তু আগে সে সৎ বস্তু পায় নাই, বেদান্তের পথে চলে নাই। ইউরোপ চলিয়াছে ধীরে ধীরে নীচে হইতে গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক স্তর প্রত্যেক সোপান ক্রমে পার হইয়া,—ইউরোপ সব জিনিষে চায় যে 'সায়ান্স'। ইউরোপ জ্ঞান—তুরীয়ের ভূমার জ্ঞান, দৃষ্টি (Intuition) হইতে আরম্ভ করে নাই, সে বিজ্ঞান বিশেষের জ্ঞান বিচার বিতর্ক (Intellection) হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপ তাই গোড়াতে আত্মার অপেক্ষা অন্নকেই মহীয়ান করিয়া, অধিভূতকে একান্ত করিয়া ধরিয়া ক্রমে উপরে উঠিতেছে,

অধ্যাত্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্নকে অধিভূতকেই জোর করিয়া একমাত্র সত্যরূপে ধরিতে ধরিতে ইউরোপ কি রকমে অন্নের অন্তরালে আত্মার অধ্যাত্মেরই মধ্যে যাইয়া পড়িতেছে, আধুনিক ইউরোপের সে বিবর্ত্তন-ইতিগাস খুবই চমৎকার ও শিক্ষাপ্রদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘোর জড়বাদ কি রকমে বিংশ শতাব্দীর প্রাণবাদে আসিয়া পড়িতেছে, সে প্রাণ-বাদও কি রকমে আজ অধ্যাত্মের দুয়ারে গিয়া আঘাত করিতেছে তাহার পরিচয় সুধী-সমাজের সকলেই জানেন। প্রথমে হীকেলের materialism, তারপর বের্গসনের vitalism, তারপর অয়েকনের spiritualism।

তারপর আমরা আরও বলিতে চাই, ইউরোপে যে অধ্যাত্ম-প্রবাহ ভিতরে ভিতরে জাগিয়া উঠিতেছে তাহা ভারতের বিশাল অধ্যাত্ম-সিদ্ধি অপেক্ষা বেশী সজীব সতেজ। হইতে পারে অধ্যাত্ম-দৃষ্টির সম্মুখে এখনও একটা আবরণ রহিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হইতে পারে নাই, এখনও সেখানে আছে অনেকখানি চঞ্চল অশুদ্ধ রজঃ; কিন্তু তবুও তাহা জীবন্ত, ভারতের আধ্যাত্মিকতার মত তাহা তমঃ-প্রধান নহে। আর ইউরোপের আধ্যাত্মিকতা—সে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া সকল সত্যকে কুড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়—জগৎকে পৃথিবীকে অন্নকে বাদ দিতে চাহিতেছে না, তাহার

চেষ্টা জগৎকে পৃথিবীকে অন্নকে বেড়িয়া ধরিতে, অন্নকেও আত্মারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে। ইউরোপ তাহার সমস্ত নূতন শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়া আজ এই কথাই ব্যক্ত করিতেছে— অসীমের অরূপের আনন্দ ভাগবত রসই চাই; কিন্তু সীমার রূপের আনন্দ পার্থিব রসেরই মধ্যে। ইউরোপের আজ-কালকার সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক সকল বিপ্লব সকল আলোড়ন আন্দোলনের মধ্যে এই কথাই ফুটিয়া উঠিতেছে। Socialism, Syndicalism, Bolshevism অর্থাৎ সমাজের শূদ্রশক্তি— কার্য্যপ্রণালী তাহার যতই বিকৃত বিকট হউক না কেন, সজ্ঞান আদর্শ তাহার যতই অসম্পূর্ণ থাকুক না কেন—ইহার অন্তরের প্রেরণা হইতেছে অন্নকে ধরিয়া অন্নকে ঘিরিয়া সমাজের একটা আধ্যাত্মিক রূপ দিতে।

অন্নবাদী ইউরোপের প্রাণে আত্মার সাড়া দিয়াছে, আর অধ্যাত্মবাদী ভারতের প্রাণ অন্নের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। শূদ্র ইউরোপ ব্রহ্মণ্য পাইতে চাহিতেছে, ব্রাহ্মণ ভারত শূদ্রকে বরণ করিতে চলিয়াছে। এক স্থানে দেহ চাহিতেছে আত্মা, আর এক স্থানে আত্মা চাহিতেছে দেহ। এই দুইটি ধারা একই ভাবের অভিব্যক্তি, দুই দিক হইতে একই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রয়াস। এসিয়া ও ইউরোপ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে জগতের পরম কল্যাণ যাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহারা এই কথাটিই বলিতে চাহেন।

অধ্যাত্মজীবন আর কর্ম্ম ও ভোগ জীবন, সৎপ্রতিষ্ঠা আর পার্থিব প্রতিষ্ঠানসমূহ মিলাইয়া ধরিতে হইবে। ব্রহ্মকে অন্নের মধ্যে জীবন্ত করিতে অন্নকে ব্রহ্মসত্তায় গড়িয়া তুলিতে হইবে; পৃথিবীকে স্বর্গে রূপান্তর করিতে স্বর্গকে পৃথিবীর উপর নামাইয়া ধরিতে হইবে। পৃথিবী ও স্বর্গ, দেহ ও আত্মা, অন্ন ও ব্রহ্ম একই সত্তার দুভাগ, দুইদিকে দুইভঙ্গী, উভয়কে লইয়া পূর্ণ জীবন পূর্ণ পরমার্থ।

অন্ন শুধু অন্নের জন্য প্রিয় নয়, আত্মারই জন্য অন্ন প্রিয়—তাই বলিয়া এ কথা সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, অন্নের প্রয়োজনীয়তা নাই বা অন্ন প্রিয় নয়। অন্নও প্রিয়, আত্মাও প্রিয়; উভয়ে মিলিয়া এক মহাপ্রিয়কে সৃষ্টি করিতেছে। আত্মা প্রিয় হয় না তখন যখন শুধু অন্নকেই দেখি, অন্ন যখন আত্মাকে ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখে; কিন্তু আবার প্রিয় হয় না যখন শুধু আত্মাকেই দেখি, আত্মা যখন অন্নকে গ্রাস করিয়া লোপ করিয়া ফেলে। তাই আজ জগতের—মানব জাতির অন্তরাত্মা ইউরোপের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছে অন্নকে ব্রহ্মরূপে পাইয়া আনন্দ-উপলব্ধি করিতে, আর ভারতের মধ্য দিয়া সাধনা করিতেছে ব্রহ্মকে অন্নরূপে পাইয়া ভোগ করিতে।

ভারতের অধঃপতনের কারণ

ভারতের অধঃপতন হইল কেন? এত বড় যে জাতি, শিক্ষাদীক্ষায় যে ছিল জগতের শীর্ষ দেশে, যাহার মত এত বিষয়ে এত প্রতিভা কেহ কোথাও দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ, সে কিরূপে, কোন্ কারণপরম্পরায় আজকালকার মত এমন দীন দুর্ব্বল মুমূর্ষু অবস্থায় নামিয়া পড়িয়াছে? অধঃপতনের মোটা কারণ, অথবা সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে জীবনী-শক্তির হ্রাস। ব্যক্তির পক্ষে যেমন, একটা জাতির পক্ষেও তেমনি। দৌর্ব্বল্য রোগ মৃত্যু আসিয়া হানা দেয় তখনই, যখন প্রাণের তেজ কমিয়া যায়, জীবনীশক্তির অপহ্নব ঘটে। কিন্তু ভারত ছিল যেন সকল শক্তির উৎস। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে,

একাধিকবার সে নূতন আব্‌হাওয়ার মধ্যে পড়িয়া পতনের দিকে ঝুঁকিয়াছে; কিন্তু কিছুকালের জন্য কেবল, আবার কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া, নূতন জীবনে প্রণোদিত হইয়া সুস্থ সবল মহান হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে * ভারত যে সঙ্কটের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে, এমন অবস্থা তাহার আর কোন দিন হয় নাই, বাস্তবিকই আজ তাহার জীবনমরণের সমস্যা। কেন এমন হইল? কোন্ পাপে—কোন্ অনিয়মে অধর্ম্মে সে তাহার প্রাণ-শক্তি এমনভাবে হারাইয়া বসিয়াছে?

ভারতের জীবনীশক্তি তিনটি কারণে হ্রাস পাইয়াছে। এই তিনটি হেতুই প্রধানতঃ তাহার অধঃপতনের মূলে। আমরা একে একে ইহাদের বিবৃতি করিতেছি।

প্রথম—কাল হিসাবে ও প্রাধান্য হিসাবে—গোড়ার হেতু হইতেছে সন্ন্যাসের, বৈরাগ্যের, মায়াবাদের প্রভাব। সন্ন্যাসের আদর্শ কি বলে? জগৎটা মিথ্যা, জীবনের আয়তন হইতে কর্ম্ম হইতে অবসর লওয়াই মানুষের চরম সার্থকতা। প্রবৃত্তির যে খেলা, যাহা লইয়া মানুষের সাধারণ সামাজিক জীবন, তাহা হইতেছে মানুষের নীচের প্রকৃতি, প্রাকৃত স্বভাবের বিকাশ। মানুষ যদি

* ঠিক বর্ত্তমানে হয়ত বলা যাইতে পারে যে ভারত তাহার সঙ্কটের অবস্থা পার হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার উর্দ্ধগতি—কিন্তু এ কথার আলোচনা আমরা করিতেছি না।

তাহার স্বরূপ, তাহার উর্দ্ধতর প্রকৃতিকে চাহে তবে তাহাকে প্রবৃত্তির ধারা সংযত করিতে হইবে, বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, তাহাকে নিবৃত্তির পথে চলিতে হইবে। পৃথিবী হইতে জাগতিক প্রতিষ্ঠান হইতে, সকল রকম বহির্ম্মুখী প্রেরণা হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া শান্ত ব্রহ্মে সমাহিত হওয়াই পরম পুরুষার্থ। *

জীবন হইতে নিস্তার পাওয়াই যে-ধর্ম্মের মূল কথা, সে-ধর্ম্মের প্রভাবে জীবন যে ক্রমে শুকাইয়া উঠিবে তাহা বলা বাহুল্য। প্রবৃত্তি সানন্দে আপন পথে চলিতে চলিতে পদে পদে যেখানে প্রতিহত হইয়াছে,—শুনিয়াছে কেবল এই কথা যে মানুষকে সে সত্যবস্তু হইতে ভুলাইয়া মিথ্যার দিকেই চালাইয়া লইয়াছে, তাহার কাজের মূল্য বা মর্য্যাদা আখেরে কিছুই নাই—সেখানে সে যে ক্রমে আপনাকে গুটাইয়া লইবে, সঙ্কুচিত ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িবে তাহাও স্বাভাবিক। সমস্ত জীবনই একটা বিষম মরীচিকা বলিয়া যেখানে ধারণা, সেখানে জীবনীশক্তি ফুটিয়া কখন উঠিবে না, ক্রমে ক্রমে লোপই পাইবে।

অবশ্য বলা যাইতে পারে, সন্ন্যাসের আদর্শ কখনও আপামর

* ভারতের যে সত্যকার আধ্যাত্মিকতা,—যাহার নিদর্শন পাই বেদে, উপনিষদে, গীতায়—তাহা জীবনকে কর্ম্মকে কখন ত্যাগ করে নাই, বহিষ্কার করে নাই। তাহার মন্ত্র ছিল, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ…ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" (ঈশ-উপনিষদ)

সকলের জন্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। সন্ন্যাসীরা আশাও করেন না এবং চাহেনও না যে পৃথিবীর যাবতীয় লোক তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পাহাড়ে জঙ্গলে চলিয়া গিয়া ধ্যানস্থ হউক। জীবনের—প্রবৃত্তির প্রয়োজন তাঁহারাও স্বীকার করেন। পরমার্থ হিসাবে জগৎ সত্য না হইলেও, ব্যবহারিক হিসাবে তাহা সত্য। ব্যবহারিক জীবনের ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে সময়ে সহজে বৈরাগ্য যখন আসিবে তখনই পরমার্থ সাধনার অধিকার জন্মে। সমাজের চূড়ায় সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পথ গৃহীর প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া, গৃহীর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া।

কথাটি সত্য। কিন্তু এই সন্ন্যাসের আদর্শ আস্তে আস্তে এমনভাবে প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সাধারণের মনে এতখানি ছড়াইয়া গিয়াছিল, যে আর সকল আদর্শ ইহার কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া দেখা দিল। আসল সত্য, আসল কল্যাণ জগতের বাহিরে, সুতরাং যত শীঘ্র পারা যায় যেন-তেন-প্রকারে ঐহিকের পালা সারিয়া চলিয়া যাওয়াই হইল লক্ষ্য। শুধুই কি তাই, জীবনের ওপারে চলিয়া যাইবার পক্ষে জীবনটা রাস্তা নয়, একটা বিপুল বাধারূপেই দেখা দিল। আমাদের মনে "সংসারী"র অর্থ হইল অধম পাপী। জীবন-আয়তনের মধ্যে থাকিয়া আমরা জীবনকে, জাগতিক কর্ম্মকে ঘৃণা করিতে সুরু করিলাম; কর্ম্মকে

বাড়ান ত' দূরের কথা, তাহার গোড়া খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিতে চাহিলাম।

মনে এই ভাব থাকিলেও বাহিরে সত্য সত্যই সাধারণ যে বিবাগী হইয়া পড়িল তাহা নয়—"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।" তবে হইল এই,—প্রথমতঃ, কর্ম্মজীবনের মধ্যে রহিয়াও কর্ম্মের প্রবৃত্তি আমাদের দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া আসিল, একটা নিরানন্দ অবসাদ আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মজীবন আমাদের থাকিল বটে, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই, তবে তাহা থাকিল একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, ক্ষীণভাবে ছোট ছোট কাজ লইয়া, জীবনধারা নামিয়া পড়িল একেবারে শরীর স্তরে, পশুসুলভ বৃত্তিগুলিই একমাত্র সত্য হইয়া উঠিল—কর্ম্মের বৃহৎ আদর্শ সব আমরা হারাইলাম. ব্যবহারিক জীবনে সমষ্টিগত সমুচ্চ প্রয়াস আমাদের লোপ পাইল, নিজের ও নিজের পরিবারের দৈনন্দিন অভাব কোন প্রকারে মিটাইয়া চলাই আমাদের লক্ষ্য হইল—ইহারই নাম প্রাক্তনক্ষয়। জীবনীশক্তির যে সকল বহুবিধ মহান্ সৃষ্টি তাহা আমাদের কাছে অর্থশূন্য হইয়া পড়িল। নিস্তেজ ক্ষুদ্র প্রাণে যত পচা গলদ জমা হইয়া উঠিল—ক্ষুদ্র দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা আর আহার-নিদ্রা-মৈথুন ইহাই জীবনের সমস্ত অর্থ।

ভিতর হইতে এই যে প্রাণশক্তি সঙ্কুচিত ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছিল, বাহির হইতেও তাহাকে আবার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া

ফেলা হইল। ধর্ম্মশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা রচিয়া দিল—জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত কি ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। আইনকানুন বিধিনিষেধ আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন প্রতিপদে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের যে ছক স্মার্ত্তেরা কাটিয়া দিলেন তাহার একান্ত অনুগত হইয়াই জীবন-ধারাকে চলিতে হইল, সমাজের অত্যাচার ও তাড়নার ভয়ে তাহার একটুও এদিকে ওদিকে চলিবার সাধ্য আমাদের রহিল না। প্রথমে হয়ত যে বিধান ছিল সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শৃঙ্খলা, পরিশেষে তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া দারুণ শৃঙ্খলে পরিণত হইল। কিন্তু জীবনের জীবন্তধারা শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে চলে না, চলিতে পারে না। জীবনের আছে নিজের ছন্দ, সে সৃষ্টি করে নিজের নিয়ম। যে নিয়মাবলী এই ভিতরের ছন্দ ও নিয়মের তোয়াক্কা রাখে না, তাহাকে দিয়া জীবনের সহজ সমর্থ প্রকাশ হয় না, জীবনের বেগ তাহাতে পদে পদে বাধা পাইয়া শীর্ণ শ্লথ হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাপকেরা সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য এত বাহিরকার এত খুঁটিনাটি নিয়ম সব বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, যে, জীবনশক্তি তাহার সহজ আনন্দের পথ হারাইয়া একটা নির্ম্মম যন্ত্রের তাড়নায় কেবল চলিতে লাগিল। ফলে, আমরা প্রাণহীন হইয়া পড়িলাম, আমাদের জীবন হইয়া পড়িল কতকগুলি সূত্র-সমষ্টি। প্রাণশক্তিকে হয়ত আমরা উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী হইয়া চলিতে দিতে চাহি নাই, একটা

সংযমের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ আমরা চাহিয়াছিলাম - কিন্তু প্রথম প্রথম যাহাই হউক ক্রমে ক্রমে শেষে আমরা হারাইয়া বসিয়াছিলাম—বন্ধনের মধ্যে মুক্তিকে কি প্রকারে অটুট রাখা যায়, নিয়মের মধ্যে কি রকমে ব্যতিক্রমের যদৃচ্ছাগতির অবকাশ রাখা যায় সেই চাতুর্য্য, সেই 'কর্ম্মসুকৌশলম্' ।*

ভারত যে তাহার প্রাণশক্তি হারাইল এই তাহার দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় কারণটির কথা এখন আমরা বলিব। তাহা হইতেছে বর্ণভেদের—শ্রেণীভেদের কঠিন গণ্ডী সব—যাহার দরুণ ভারত শতধা সহস্রধা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী আমরা আর্য্যজাতি, এই আমাদের গৌরব। কিন্তু বস্তুতঃ কতরকমের রক্তধারা মিশিয়া যে ভারতবাসীকে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই ;—ভারতের যদি কিছু আর্য্যত্ব থাকে, তবে তাহা রক্তে

---

* অনেকে বলিয়া থাকেন, ভারতের এই 'কমঠ-ব্রত'—এই কঠোর বিধিনিষেধের গণ্ডী ভারতের স্বধর্ম্মকে, হিন্দুত্বকে বিদেশী-বিধর্ম্মী-প্লাবনের যুগে রক্ষা করিয়াছিল। কথাটা আংশিক ভাবে হয়ত সত্য। কিন্তু ভারতের সহজ প্রাণশক্তিতে আপন পথে সজীবভাবে চলিতে দিলে ভারত যে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না, বিদেশী বিধর্ম্মীকে আপনার মত করিয়া আত্মসাৎ করিতে—আর আত্মসাৎ করিতে যতটুকু পারিত না তাহা উদ্ধার করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে অসমর্থ হইত, এমন কথাও নাই। তা ছাড়া, এই 'কমঠ-ব্রত' যতটুকু উপকার করিয়াছে, জীবনীশক্তিকে অন্ধকূপে বন্ধ করিয়া এক রকম দলিয়া পিষিয়া তদপেক্ষা বেশী অপকারই করিয়াছে।

নয়. শিক্ষা দীক্ষায়—যদিচ সে শিক্ষা-দীক্ষারও মধ্যে আর্য্যেতর অনেক শিক্ষা-দীক্ষা মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ভারত যখন জীবন্ত শক্তিমান ছিল, তখন সেই জীবন ও শক্তি সে অনেকখানি পাইয়াছিল প্রতিনিয়ত নূতন রক্তের, নূতন প্রাণ-ভারের আমদানি করিয়া। কিন্তু পরে জাতির বন্ধন যতই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল, একই জাতির মধ্যে আবার নানা উপ-জাতির সৃষ্টি হইল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান, বিবাহ-সম্বন্ধ বন্ধ হইয়া গেল, ততই সকলের রক্তের জোর হ্রাস পাইয়া চলিল। রক্তের শুদ্ধি বজায় রাখিবার প্রয়োজন সময় সময় হইতে পারে বটে। একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী যখন শিক্ষা-দীক্ষায় আকৃতিতে প্রকৃতিতে পায় একটা বৈশিষ্ট্য. তখন সেই বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্বন্ধে একটা অস্পৃশ্যবাদ তাহাকে মানিয়া চলা প্রয়োজন। কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা গুণাবলীকে এই রকমে অনেক দিন জিয়াইয়া রাখা চলিলেও চিরকাল কখন রাখা সম্ভব নয়; কালে তাহাদের অবনতি ঘটিবেই। তা ছাড়া, একটা বিশেষ গুণের ধারাকে চিরকাল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়; কারণ, সময়ের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে পুরাতন গুণাবলীর সার্থকতা কমিয়া যায়, প্রয়োজন হয় নূতন গুণাবলী, যুগধর্ম্মানুযায়ী বৈশিষ্ট্য। শুধু শুদ্ধতার খাতিরে শুদ্ধতা. তখন হয় আত্মাভিমান ও গোঁড়ামীর পরিচয়, তাহা লইয়া চলে আত্মহত্যার পথে।

অধঃপতনের কারণ

সমাজের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা আকৃতি-প্রকৃতি হিসাবে একটা মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ, এমন কি স্তরবিভাগও চলিতে পারে। মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজন আপনা হইতেই সেই দিকে চলে, তজ্জন্য বিশেষ যে নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দিবার দরকার আছে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু আজকালকার আমাদের সমাজে যে রকমটি দেখিতে পাই—বর্ণে বর্ণে দূরের কথা, প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক দলের চারিদিকে এক একটি অভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহার ফলে হইয়াছে এই যে, সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র আমাদের অতি সঙ্কীর্ণ, দুই চারিটি পরিবারের মধ্যেই পুরুষানুক্রমে যাহা কিছু আদান-প্রদান সমস্ত চলিয়া আসিয়াছে। একই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পুরাতন খাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে চলিতে রক্ত তরল হইয়া গিয়াছে প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সমস্ত কারণের মোট ফল হইল ক্রমে দেশের পরাধীনতা। সমাজে সকল সত্ত্বেও যতটুকু বা প্রাণ ছিল তাহা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল পরাধীনতার চাপে। ভারতের ভাগ্যের উপর এই হইল—Coup de grace—মৃত্যুবাণ।

ভারতের আত্ম-প্রতিষ্ঠা

ভারত আজ মুমুক্ষু। ভারত আজ চাহিতেছে স্বরাজ অর্থাৎ স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য। ভারত নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া নিজে দাঁড়াইয়া উঠিবে, নিজের প্রতিভা বিকশিত করিয়া চলিবে—ইহাই আমাদের আকাঙ্খা ও আদর্শ। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতেছি, সে প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেছে বাহিরের প্রভাব, বিদেশীর চাপ—পরতন্ত্রতা। ইংরাজ জোর করিয়া আমাদের উপর যে চাপিয়া রহিয়াছে তাহার ফলে আমাদের বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হইতেছে যে আইন-কানুন, সেই স্থূল শৃঙ্খলের কথা বলিতেছি না। বলিতেছি সেই সব সূক্ষ্মভাবের ভঙ্গীর কথা যেগুলি অজ্ঞানবশতঃ অশক্তি বশতঃ অবশ হইয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি—বিদেশীর জীবন হইতে।

ভারতের আত্ম-প্রতিষ্ঠা

ইংরাজের রাষ্ট্রীয় কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমরা ব্যগ্র, কিন্তু আমরা দেখিতেছি না, সেই সঙ্গে সঙ্গেই কি রকমে আমরা ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার কবলে পড়িয়া যাইতেছি। দৈহিক মুক্তির বদলে আমরা বরণ করিয়া লইতেছি প্রাণের মনের—অন্তরাত্মার দাসত্ব!

পাশ্চাত্যের প্রাণ দুইটি ধারায় দুই রকমে আমাদের প্রাণকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। প্রথম একেবারে সোজাসুজি, স্পষ্টাস্পষ্টি, কোন রকম আবরু-পর্দ্দা না দিয়া। অর্থাৎ আমরা কতকগুলি বিষয়ে ইউরোপকে হুবহু আনিয়া ভারতে বসাইয়া দিতে চাহিতেছি। অবশ্য ইউরোপের সহিত প্রথম সংস্পর্শে আমরা যে রকম অতি স্থূলভাবে ইউরোপের অনুকরণ করিতাম, এখন ঠিক তেমনটি করি না। তখন পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আদব-কায়দা, কথাবার্ত্তা ও মোটামুটি ধরণে ভাবনা-চিন্তা—এই সকল বিষয়ে আমরা ইউরোপীয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। তখন আমরা বেশীর ভাগ জোর দেই আদর্শের শিক্ষাদীক্ষার উপর। ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকতম আবিষ্কার বা মতবাদ কি, তাহারই খোঁজে আমরা আছি এবং মনে করি যে, বিশ্বের সহিত মানবজাতির সহিত ওয়াকিব্‌হাল হইয়া চলিতে হইলে আমাদের দরকার সেইগুলির সহিত একাত্ম হওয়া, সেইগুলি আমাদের জীবনেও ফুটাইয়া ধরা। রাষ্ট্রীয় জীবনে তাই আমাদের দেশেও দেখিতেছি,

কোথাও কোথাও বোলশোভিক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস চলিতেছে—কুলি-মজুরদিগকে তাহাদের মনিবদের বিরুদ্ধে খেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, বলা হইতেছে জমির স্বত্ব আর কারও নাই, আছে শুধু তার যে জমি চাষ করে। সামাজিক জীবনে, নারী শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নারী-বিদ্রোহের ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছি। সাহিত্যে শিল্পে কলায় আমরা চাহিতেছি, ফরাসীর সব চেয়ে আধুনিক ঔপন্যাসিক, জর্ম্মনীর সুইডেনের সবচেয়ে আধুনিক নাট্যকার, রুষিয়ার সবচেয়ে আধুনিক চিত্রকর শিল্পের কি আদর্শ দিতেছেন, তাহাকেই চরম আদর্শ বলিয়া ধরিতে।

এই ভাবের ভাবুক যাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম যে কিছু কম তাহা নয়, তবে তাঁহাদের স্বদেশপ্রেমে রহিয়াছে একটা ব্যস্ততা, একটা আশঙ্কা, একটা লোভ। তাঁহারা চাহেন যে ভারত জ্ঞানে গুণে শক্তিতে সিদ্ধিতে একেবারে জগতের মহাসভার মধ্যে যেন আপন আসন করিয়া লয়। ভারত যেন আর কূপমণ্ডুক না থাকে, বিশ্বমানবজাতির খোলা প্রাণের হাওয়া তাহার প্রতি অঙ্গভঙ্গে যেন খেলিয়া যায়। তাই তাঁহাদের দৃষ্টি স্বতঃই গিয়া পড়ে ভারতের বাহিরে কোথায় কি নূতন বার্ত্তার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে জানিতে, শুনিতে, নিজের ঘরে তুলিয়া লইতে। এই ঔৎসুক্য ভাল জিনিষ। কিন্তু ইহার বাড়াবাড়িও আছে। নূতন বার্ত্তার যখন আমরা বাদবিচার করি না, হুজুগের বশে তাহার

উপর চলিয়া পড়ি, আমরা তাহাকে আত্মসাৎ না করিয়া সেইটিই যখন আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বসে, তখন জিনিষটি আত্মস্বাস্থ্যের থাকে না।

আমরা দেখি না কি, ভারতবাসী ভারতের বাহিরে যে যেখানের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি সেই দেশের ভাবুক হইয়া পড়িয়াছেন, সেই দেশের ধরণধারণ আদেশ অনুসারেই ভারতের নব জীবনকে গঠিত করিতে উপদেশ দিতেছেন! জাপানে যাইয়া আমরা জাপানী, আমেরিকায় যাইয়া আমরা মার্কিন, জর্ম্মনীতে যাইয়া আমরা জর্ম্মন, রুষিয়ায় যাইয়া বোলশেভিক। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের নিজস্ব কিছু নাই, আমাদের নিজের অন্তরাত্মার খোঁজ আমরা পাই নাই। একটা জীবন্ত শক্তিমান যে-কোন ভাবস্রোতের মধ্যে পড়িলেই আমরা আপনহারা হইয়া যাই। দেশে দেশে যে সমস্যা ঘটিতেছে, সে সব সমস্যার যে সব সমাধান চলিতেছে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সেই সেই দেশের বিশেষ অবস্থা, তাহার জীবনের অতীত ধারার বিশেষ প্রয়োজন। রুষিয়ায় যে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ আজ উঠিয়াছে অথবা ফরাসীদের মধ্যে যে নূতন শিল্পকলার আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা জড়িত সেই সেই দেশের অন্তরাত্মার প্রয়োজনের সাথে সথে। সেই-গুলিকে হুবহু উঠাইয়া আমাদের দেশে স্থাপিত করার চেষ্টার অর্থ, নিজের দেশের সত্য প্রয়োজন কি তাহা আমরা জানি না, নিজের

অন্তরাত্মার জিজ্ঞাসার খবর আমরা রাখি না, পরের জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া তাই একটা কৃত্রিম খোসখেয়ালের বিলাসে আমরা মজিয়া যাইতে চাই।

তাই আর এক দল আছেন আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভারতকে চাহেন সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে। ইউরোপের কোন রকম অনুকরণ বা অনুসরণ ত' তাঁহারা করিতেই চাহেন না, ভারতীয় জীবনের গঠনের সূত্রই তাঁহাদের হইতেছে ইউরোপের সহিত বিরোধ। অর্থাৎ ইউরোপ যাহা কিছু করিতেছে তাহার উল্টাটা করাই, তাঁহারা মনে করেন, হইতেছে ভারতের স্বাতন্ত্র্য স্বধর্ম্ম ফুটাইয়া তোলা! ইউরোপ কলকারখানার পক্ষপাতী; সুতরাং কলকারখানা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের অর্থনীতিক জীবন গড়িতে হইবে। ইউরোপ আসুরিক, হিংসাপরায়ণ, স্থূল-শক্তির উপাসক; সুতরাং আমাদিগকে হইতে হইবে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ অহিংস-সদাচারী সাধু প্রকৃতির। কিন্তু এই নীতিপন্থায়, ইউরোপের 'না' দিয়া আমাদের 'হাঁ' স্থির করার প্রয়াসে, আমরা আমাদের নিজ সত্তা,—আমাদের আত্মসত্তার প্রতিভা খুঁজিয়া পাই না, বরং বাধ্য হইয়া আমরা ইউরোপেরই অনুকরণ করি। ইউরোপকে বর্জ্জন করার অর্থই যখন হয় ভারতকে অর্জ্জন করা, তখন বস্তু হিসাবে ইউরোপকে ত্যাগ করিলেও দেখি, ভাবে ভঙ্গীতে আমরা ইউরোপের পথেই চলিয়াছি। ইহাকেই বলে শত্রু-

ভাবে সাধনা। বড় বড় কলকারখানা আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপদেশ দেই, অথচ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহি চরকা, মাকু—সেটা কি কম যন্ত্রের অত্যাচার! ইউরোপের জড়বাদ ত্যাগ করিতে করিতে কি আমরা ইউরোপেরই খৃষ্টানী সাধুত্ববাদকেই আধ্যাত্মিকতার চরম বলিয়া মানিয়া লইতেছি না? জাতীয় শিক্ষা যে ভাবে দেওয়া হইতেছে, তাহা কি দেশীয় ভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষাই নয়? আর আজকাল যে নবনাট্য গঠনের চেষ্টা হইতেছে, তাহার মধ্যেও আমাদের সন্দেহ হয়, ভারতের নিজস্ব শিল্প-প্রতিভার বিকাশ ততখানি নাই, যতখানি আছে ইউরোপের কেবল বাহিরকার সাজসজ্জার প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার প্রয়াস।

তাহা নয়, ভারতকে ইউরোপের, বিদেশের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। সেই জন্য খুঁজিতে হইবে ভারতের আত্মা কি?—ভারতের শিক্ষাদীক্ষার ধারা কি?—কি ভঙ্গিমায় ভারতের অন্তরাত্মা আপনাকে যুগে যুগে বিকশিত করিয়া আসিয়াছে। জ্ঞানে বুঝিতে হইবে, প্রাণে ধরিতে হইবে সেই সত্য, যাহা বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রে প্রথম মুখরিত হইয়াছে, যাহা রামায়ণের, মহাভারতের, মৌর্য্য-গুপ্ত-চেরা-চোল-পাণ্ড্যদের মহাকর্ম্মবীরেরা সমষ্টি-জীবনে ফলাইয়া ধরিয়াছেন, যাহার মূর্ত্ত বিগ্রহ দেখি অজন্তায়, কোণারকে, শ্রীরঙ্গমে। জীবের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম

যেমন বুঝা যায় না, শুধু তাহার জীবনের কর্ম্ম দিয়া, সেই রকম শুধু বর্ত্তমান নয়, সমস্ত অতীতকে বুঝিতে হইবে—দেশের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

সেই জ্ঞান, সেই অন্তপ্রেরণার সহায়ে তবে বর্ত্তমান সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হইতে হইবে। তবেই পাইব, এই সব সমস্যার যথাযথ সমাধান। নতুবা আমাদের চোখে ভারতের বর্ত্তমানে যে সমস্যাটি কি তাহাই ধরা পড়িবে না। ইউরোপের রোগের দুই-একটা লক্ষণ আমাদের দেশে দেখিয়া বা কল্পনায় আরোপ করিয়া যদি দেশকে রোগমুক্ত ও সুস্থ করিতে অগ্রসর হই, তবে সে চেষ্টা হইবে কৃত্রিম এবং তাহার বিফলতা অনিবার্য্য। বর্ত্তমানে আমরা যে কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, আমাদের সব চেষ্টা ও যত্নই যে হাওয়ায় হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে, আমরা যে অন্ধকারে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি, তাহার কারণই এইখানে। আমরা দেশের ধাত জানি না, তাহার অভাব অভিযোগ জানি না, তাহার প্রয়োজন জানি না। বিদেশের অবস্থার ধরণ-ধারণ দিয়াই—কোথাও 'ইতি'ভাবে, কোথাও 'নেতি'ভাবে—দেশের অবস্থা বুঝিতে চাহিতেছি। কাজেই আমরা—

কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে।

ভারতের ঋষি-দৃষ্টি

দেশের দরকার প্রাণ-শক্তি, সমৃদ্ধ তেজীয়ান জীবন। এই জীবনী-শক্তি সে যাহাতে পায় সেই পথ তাহাকে দেখাইয়া দাও। যে পথে জীবনের তেজ স্তিমিত হইয়া আসিবে, জীবনের উপর বিরাগ জন্মিতে থাকিবে সে পথের নির্দেশ আর দিও না। ভারত ত অনেকদিন ধরিয়াই জীবন-ধারার উল্টা পথে চলিয়া দেখিয়াছে—'কা তব কান্তা' জপিতে জপিতে, কৌপীন সার করিয়া সে যে "গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া" হইয়া অনেক দিনই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে আদর্শ আর তাহার পক্ষে নূতন কিছু নয়। সে আদর্শের সাধনায় মিলিয়াছে কি? অমৃত নয়—মৃত্যু, সমাধি নয়—লয়। জীবনকে ফাঁকি দিয়া, জীবনাতীত হইতে চাহে কে?

শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষোত্তমের দর্শন পাইবে কে? লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া নারায়ণকে স্পর্শ করিবে কে?

ভারতের সে মোহ ভাঙ্গিতেছিল। ভারতের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সোণার কাঠির স্পর্শে আবার ভারতকে বাঁচাইয়া তুলিতেছিল। চক্ষু মেলিয়া ভারত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে কি একটা কুহকের বশে সে কোন্ বাঁকাচোরা পথে চলিয়া অন্ধকার হইতে অন্ধকারেই ডুবিয়া যাইতেছে, আর ইতিমধ্যে মানবজাতি জ্ঞানে গৌরবে কতদূর কোথায় উঠিয়া গিয়াছে—তাহারই সমৃদ্ধিতে আর সকলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, নিজে সে কিন্তু দীন হইতে দীন, হীন হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছে। এই নবীন উষার নূতন দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহার বহুপুরাতন সিদ্ধি, তাহার সুদূর অতীতের একটা বিস্মৃত দীক্ষা, তাহার অন্তরাত্মার সনাতন ধর্ম্ম।

যে ধর্ম্ম তাহার বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে মন্ত্রায়িত হইয়া উঠিয়াছে, যে ধর্ম্ম তাহার কবি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাসের দিব্য লেখনীতে বিচিত্র হইয়াছে, যে ধর্ম্ম চাহিয়াছে জীবন-প্রতিভা, ঐহিক আয়তনে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি তাহারই দিকে ভারত আবার শনৈঃ শনৈঃ চলিতেছিল। আজ কেন তবে এই মৃত সঞ্জীবনীকে ভোগের মদিরা বলিয়া আমরা ফেলিয়া দিতে চাহিতেছি? ভোগের জিনিষ কি এতই দুষ্য? পশুরই শুধু ভোগ আছে, দেবতার ভোগ নাই? ঔদরিকের রসাস্বাদন আছে বলিয়া, শিল্পীরও রসাস্বাদন

বর্জ্জন করিতে হইবে? মানুষ অসুর হইয়া পড়ে বলিয়া ভৃগুনন্দনের ক্ষাত্রতেজে তুমি কলঙ্ককালিমা লেপন করিবে? ইন্দ্রিয়পরায়ণ তুমি অসমর্থ বলিয়া, স্বর্গেরও অপ্সরাকে কাড়িয়া লইয়াছিল যে বীর পুরুরবা তাহার নিন্দাবাদ করিবে?

যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্

যশের জন্য যুদ্ধে জয় করিয়া চলিবে, বংশবৃদ্ধির জন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া চলিবে -- এই ত স্পষ্ট নির্দ্দেশ। ধন-ধান্যে, অলঙ্কারে-ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানে-শক্তিতে সকল রকম সামর্থ্যে আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে; তোমার সামাজিক জীবনের ইহাই ত আদর্শ। জগতে যতক্ষণ তোমার কর্ম্ম, ততক্ষণ তোমার যাবতীয় অঙ্গ খেলাইয়া সেই কর্ম্ম বহুল বিচিত্র পরিপুষ্ট ভাবে উদ্‌যাপন করিও। কোথাও কুণ্ঠা, দীনতা, ক্ষুদ্রতা রাখিও না। বৃহৎ ভোগের সামর্থ্য যাহার, তাহারই বৃহৎ ত্যাগে অধিকার—ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং, ত্যাগের আগে প্রয়োজন যে প্রভৃত সঞ্চয়।

যৌবনে বিষয়ৈষিণাং বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্

যৌবনে 'বিষয়ী' হইবে, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবে আর অন্তিমে যোগের সহায়ে দেহত্যাগ করিবে। কিন্তু যৌবনেই যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, যোগের সহায়ে দেহত্যাগ করিতে চাহে,

সে কখন জানেও না যৌবন কি, মুনিবৃত্তিই কি, আর যোগই বা কি ; তাহার দেহত্যাগ করাই সার।

ব্যক্তিবিশেষের কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে সাধারণের। গোষ্ঠীগত জীবনেব আদর্শ কি, লক্ষ্য কি, পথ কি? বুদ্ধ পূর্ণযৌবনে স্ত্রী-পুত্র রাজকার্য্য ফেলিয়া পথের কাঙ্গাল হইলেন, শঙ্করাচার্য্য শৈশবেই সন্ন্যাসী হইলেন ; কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধ বা শঙ্কর যাহা করিয়াছেন ঠিক সেই কাজটি আপামর সর্ব্বসাধারণের একমাত্র আদর্শ নয়। ভিতর হইতে যাহার প্রেরণা আসে তিনি যখন যে অবস্থায় থাকুন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে পারেন—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। কিন্তু সে কথা হইতে কখন এই সিদ্ধান্ত কি হয় যে, সমাজস্থ সকলে জন্মমাত্রই মুনিবৃত্তির অভ্যাস করিতে থাকিবে, জীবনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলে যোগারূঢ় হইতে চেষ্টা করিবে?

সামাজিক জীবনের আছে একটা আদর্শ—মুনিজীবনের আদর্শ হইতে তাহা পৃথক। উভয়ের মধ্যে আছে একটা সংযোগসেতু, এ কথাও স্বীকার্য্য—সামাজিক জীবনকে ফলাইয়া চরিতার্থ করিয়া তবে সমাজের মানুষ শেষ মুনি-জীবনে উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সমস্ত সমাজকে মুনি-জীবনের ছাচে ঢালিবার চেষ্টা অর্থ ধর্ম্মসঙ্কর ; উহার ফল ভারত বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছে, আবার সে পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নাই।

যৌবনের, গৃহস্থাশ্রমের, সংসারের যে ব্রত তাহারও গোড়ায় ভারত দিয়াছিল আর একটা ধর্ম্মের চর্চ্চা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য—সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য্য আজকাল ব্রহ্মচর্য্য বলিতে যাহা আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি তাহা নহে। এই ব্রহ্মচর্য্য নীতিবাদী রুচি-বাগীশের কতকগুলি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান নহে। ইহার উদ্দেশ্য জীবনকে, প্রাণশক্তিকে, সৃষ্টিক্ষমতাকে নিগ্রহ করা, পিষিয়া মারিয়া ফেলা নহে। এই ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য জীবনের প্রাণশক্তির সৃষ্টিক্ষমতার গোড়াকার বনিয়াদ, ভিতরের পীঠস্থানটী তৈয়ারী করা। ইহার উদ্দেশ্য ছিল একটা আর্ষদৃষ্টি, আর্ষশক্তি অধিকার করা যাহা মানুষকে দেবতার সাথে, পৃথিবীকে স্বর্গের সাথে, জীবনকে জীবনের অতিরিক্ত সত্যের সাথে এক সূত্রে মিলাইয়া ধরে, যাহার কল্যাণে ঐহিকের ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই পারত্রিক অমৃত আসিয়া ধরা দেয়—ইহৈব তৈর্জিতং।

ভারতের বিষয়ৈষিণা, এমন কি ভারতের মুনিবৃত্তিরও অন্তরালে ছিল এই আর্ষভাব, তাই তাহার ভোগজীবন কর্ম্মজীবন একান্ত পশুর জীবন হইয়া পড়ে নাই, তাহার ত্যাগজীবন নিরর্থক আত্ম-পীড়নে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই আর্ষভাব কি আমরা আর তাহা সহজে বুঝি না, তাই আমাদের ভোগে কর্ম্মে সাহস নাই, ত্যাগে আনন্দ নাই। ধর্ম্মের যে আছে একটা দেশকালপাত্র ভেদ, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার

ঘাড়ে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র নির্ব্বিশেষে, সামাজিক রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে একটা মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা চাপাইয়া দিতেছি। তাই আমরা হইয়া পড়িতেছি অসমর্থ, ক্ষীণজীবি, অকালপক্ক—ইহকাল পরকাল উভয়ই আমাদের নষ্ট হইয়া চলিয়াছে।

আমরা জাগিতেছিলাম, ইউরোপের স্থূল দেহভারের চাপ আমাদের এই জাগরণের সহায় হইতেছিল। ইউরোপের কবল হইতে আমরা মুক্তিপ্রয়াসী হইয়া ভারতের সেই লুপ্ত আর্ষ প্রতিভার দিকে চক্ষু উন্মীলন করিতেছিলাম—কিন্তু ইউরোপেই আবার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধরিয়া, সেই আর্ষ প্রতিভার একটা কপট মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ মূঢ় করিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ভারত-প্রতিভার একটা উপধারা হইতেছে বৌদ্ধদীক্ষা, এই বৌদ্ধদীক্ষারও উপধারা খৃষ্টদীক্ষা, আবার এই খৃষ্টদীক্ষারও উপধারা টলষ্টয়ের দীক্ষা। আমরা আজ চলিতে চাহিতেছি এই টলষ্টয়ের দীক্ষার পথে। গাঁধীজী আজ যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাহা টলষ্টয়ী-ধর্ম্মেরই পূর্ণতর স্পষ্টতর মূর্ত্তি।

যাহার প্রাণ সত্যভাবে, অন্তরের প্রকৃতির টানে এই ধর্ম্মপথে চলিতে চাহে, সেই চলুক ঐ পথে—তাহাকে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই। তোমার নিজের অন্তরপুরুষের যদি বৈরাগ্য দেখা দিয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বেই প্রব্রজ্যা গ্রহন কর। তোমার

ব্যক্তিগত সাধনার কথা তাহা। কিন্তু সাধনার আরও পথ আছে, সিদ্ধির বহুতর রকমফের আছে। তোমার জিনিষটিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়া মনে করিও না। সর্ব্বোপরি সাধারণ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, দেশের গোষ্ঠীগত সাধনায় তাহাকে জোর করিয়া আরোপ করিতে চাহিও না।

যাহার এক বেলাও অন্ন জোটে না, তাহাকে বলিও না আহার হইতেছে পশুর ধর্ম্ম, ওটি বর্জ্জন করাই শ্রেয়ের পথ। যাহার কৌপীনটুকু জুটাইতে কষ্ট হয়, তাহাকে শিক্ষা দিও না বসন ভূষণ হইতেছে বিলাসীর নিরর্থক বিলাস। হাত তুলিবার সামর্থ্য যাহার নাই, তাহাকে হুকুম করিও না একগালে চড় খাইলে আর একগাল ফিরাইয়া দিতে। 'ক' অক্ষর যাহার পক্ষে গো-মাংস তাহার বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইও না এই শিক্ষা দিয়া, যে, পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান হয় না। সাধুর জটা-কমণ্ডলু দেখিয়াই যে ভক্তিতে গদ্‌গদ তাহাকে আর আধ্যাত্মিক বানাইয়া তুলিও না। ভুবনেশ্বরের মন্দির আর পাটের-কলের দালান, অজন্তার চিত্র আর রবিবর্ম্মার ছবিতে যে কোন পার্থক্য দেখিতে পায় না, তাহাকে এই অতিজ্ঞান দিও না যে রিক্ত শূন্যতাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প।

"অবিদ্যা"র উপাসক যাহারা তাহারা অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। উপনিষদ বলিতেছেন যাহারা কেবল "বিদ্যা"র উপাসক তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে মজ্জমান। অতি-

জ্ঞানী তুমি যদি অজ্ঞানীকে তোমার অতি জ্ঞানের পথে লইয়া চলিতে চাও তবে ফল হইবে—অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা। ভারতের আর্ষদৃষ্টি অবিদ্যা বা বিদ্যা কোনটিকেই একান্ত করিয়া ধরে নাই—এই উভয়ের সম্মিলন সামঞ্জস্য যে পাইয়াছিল, তাহাই ভারতের নিজস্ব সনাতন সম্পদ। যদি পার, সেই সম্পদ উদ্ধার কর, সেই পথে ভারতের নবজন্মের নবজীবনের উন্মেষণে সহায় হও।

সাম্যবাদ ও অধিকার-ভেদ

ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার বিশেষত্ব হইতেছে অধিকার ভেদ। হিন্দুত্বের বনিয়াদ এই অধিকার-বৈচিত্র্যেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্ব্বাচীনকালে দেশে বিদেশে যে সব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহারা বিশ্বমানবের একটা একত্বকেই একান্ত করিয়া দেখিয়াছে, তাহাদের চেষ্টা হইয়াছে সকল মানুষকে এক ছাচে একাকার করিয়া ঢালিতে। ফলে হইয়াছে এই যে ধর্ম্মের নিগূঢ়তম রহস্য সব ইহাদের মধ্যে ধরা দিতে পারে নাই। কারণ, সকল মানুষ সমান ভাবে যে সব সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহা বাধ্য হইয়াই হইবে সহজ সরল মোটামুটি অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নীচের স্তরের। এইজন্যই হিন্দু একটা কাটা ছাঁটা ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিতে পারিল না—

তুরীয় সত্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হইলেও, ব্যবহারের সত্য সম্বন্ধ— তাহার সিদ্ধান্ত হইল "বহুধা বদন্তি"। এই জন্যই তাহার ধর্ম্ম পরধর্ম্মগ্রাসী (proselytising) হইতে পারিল না। এই জন্যই আবার তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে স্তরের পরে স্তরে, উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্বরাজ্যের অনন্তশ্রেণী—বৈদিক ঋষির কথায়, সানুর উপরে সানুতে সে ক্রমে উঠিয়াই চলিয়াছে। তাই হিন্দুধর্ম্ম এত বিচিত্র, এত বহুভঙ্গিম, এত জটিল, এমন কি এত কুটিল—ইহা যে কি, আর কি যে নয় তাহার নির্দ্দেশ কিছু পাই না।

ভারতের জাতিভেদ ভারতের যাঁহারা মঙ্গলকামী তাঁহাদের নিরাশার কারণ আর যাঁহারা অমঙ্গলকামী তাঁহাদের উল্লাসের হেতু হইয়াছে বর্ত্তমানে দেখিতে পাই। কিন্তু এই ভেদপ্রাচুর্য্যের পিছনে যে কি বৃহৎ সত্য খেলিতেছে তাহা আমরা বুঝি না, তাহার সম্মান আমরা বড় করি না। প্রথমতঃ, ব্যষ্টিহিসাবে সকল মানুষ সমান নহে। প্রত্যেকের আছে শক্তির পৃথক পৃথক মাত্রা, পৃথক পৃথক ধরণ। সুতরাং প্রত্যেকের আছে আপন আপন ধর্ম্ম ও আপন আপন কর্ম্ম। সকলকে একই ধর্ম্মকর্ম্মের পথে চলাইবার চেষ্টা করিলে শুধু যে ভুল হয় তাহা নয়, তাহা হয় একটা অত্যাচার। আর উহাতে ধর্ম্মেরও অপচয় ঘটে, ধর্ম্ম কতকগুলি প্রাণহীন বাহ্য আচারে পরিণত হয়, নতুবা হইয়া পড়ে প্রাণের আবেগের অন্ধ গোঁড়ামি। হিন্দুধর্ম্ম যে যুগ যুগ ধরিয়া শত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও

টিকিয়া আছে, সে যে দেশ কাল ও অবস্থা অনুসারে নিত্যই নূতন রূপ গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছে, চিরকালই নূতন নূতন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিতেছে, তাহার কারণ এই স্বাতন্ত্র্যের, স্বধর্ম্মের, ব্যক্তির আপন আপন বিভিন্ন মুক্তিপন্থার উপর সে জোর দিয়াছে বলিয়া।

ভারতের সামাজিক জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছে এই অধিকারী-ভেদের উপর। সম্প্রদায় শ্রেণী অথবা জাতি বর্ণ যে এত বহুল এত শক্ত রকমের গণ্ডী দিয়া ঘেরা তাহার হেতু এই যে, বিশেষ স্বভাবের মানুষ একত্র হইয়া এক ধরণের ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম চিরদিন তাই বর্ণসঙ্কর ধর্ম্মসঙ্করকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। যোগ্যতা ক্ষমতা অনুসারে মানুষ আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবে, নতুবা পরের ধর্ম্মে লুব্ধ হইয়া যদি নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসি, তবে নিজের ধর্ম্ম ত সাধনা করা হইবেই না, পরের ধর্ম্মেও কখন সিদ্ধ হইতে পারিব না। তাই স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ। তাই ত ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে যখন করুণা মৈত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মণসুলভ প্রেরণায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেগুলিকে ক্লৈব্যের, কার্পণ্যের, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।

এ কথা সত্য মানুষের ধর্ম্ম বদলাইতে পারে, যদি স্বভাব তাহার বদলায়। সমাজের যে শ্রেণীতে বা স্তরে মানুষ জন্মিয়াছে সে শ্রেণীর

বা স্তরের গুণাবলী তাহার না থাকিতে পারে, সে ভিন্নরকম গুণ অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তাহারও ব্যবস্থা সমাজে যে নাই তাহা নয়। ব্রাহ্মণের গুণ পাইলে, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ-শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে, আবার ক্ষত্রিয়ের গুণ ব্রাহ্মণে পাইলে তাহার আসন যে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, এ ব্যবস্থারও উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে মানুষ সহজে তাহার স্বভাব বদলায় না, তাই ঐ নিয়মটি ব্যতিক্রমেরই মত দেখায়। তাহা হইলেও ব্যক্তির পক্ষে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্ভব হইলেও, বিভিন্ন ধর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ সমাজের অটুট একটা ব্যবস্থারূপে চিরকালই আছে।

অধিকারীভেদের জন্যই ভারতের জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব হইতেছে সঙ্ঘগত, প্রদেশগত বৈচিত্র্য (Communalism, regionalism). রাজচক্রবর্ত্তীত্ব (Imperialism) আমাদের দেশের ধাতে কোনদিনই সহিল না। যখনই কোন মহা সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের বিশেষত্ব ঘুচাইয়া একই কেন্দ্রে যুক্ত করিয়া একই প্যাটার্নে সমস্ত ঢালিতে চেষ্টা হইয়াছে, তখনই কেন্দ্রে কেন্দ্রে সে চাপের বিরুদ্ধে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য স্বধর্ম্ম বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিদ্রোহ মাথা তুলিয়াছে। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের, সমুদ্রগুপ্তের, আকবরের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য এই রকমেই ধ্বংস পাইয়াছে। শিবাজীর মহা-রাষ্ট্রের স্বপ্নও এই কারণেই ফলিতে পারিল না। আর আজকাল সমস্ত ভারতকে

রাষ্ট্রহিসাবে এক করার জন্য আমরা যে ক্লেশ পাইতেছি,—আমরা যে বলিতেছি প্রাদেশিক ঈর্ষা বা দলাদলিই আমাদের সকল কাজের অন্তরায়—তাহারও মূলে নাই কি ধর্ম্মকর্ম্মের বৈচিত্র্য, গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার প্রয়াস ?

সকল মানুষই সমান—গণতন্ত্রের এই যে নূতন বার্ত্তা আমাদের মনপ্রাণকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাহার উপর ভর করিয়া আমরা আজ দেশে সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি তাহা আমাদের দেশের কথা নয় তাহা আসিয়াছে খৃষ্টান ইউরোপ হইতে। সকল মানুষ সব কাজ করিবার উপযুক্ত, সকল মানুষের সম্মুখে থাকিবে খোলা মাঠ—যে যেমন সুবিধা পায় সে সেই দিকেই ছুটিয়া চলিবে আপন আপন পথ করিয়া লইবে—এনার্কিষ্টদের এই মত—অথবা, কাহার সামর্থ্য কি রকম তাহা বিবেচনা করিবার দরকার নাই, প্রয়োজনমত যাহাকে যে কাজ করিতে হয় সে সেই কাজই করিয়া উঠিতে পারে, সকল মানুষকে একই রকম শিক্ষা-দীক্ষার কাজকর্ম্মের কলে ফেলিয়া দিলে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ঐশ্বর্য্য ঋদ্ধি ফুটিয়া উঠিবে—সোসিয়ালিষ্টদের এই কথা দুইদিন আগে নির্ব্বিবাদে সকলে গ্রহণ করিত বটে, কিন্তু আজকাল ইউরোপের অনেক মনীষীরাও ইহার বিরুদ্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Men are born equal—সমাজগড়নের এই মূলমন্ত্র আমরা ভাবুক কল্পনাপ্রিয় রুশো'র (Rousseau) মুখ হইতে প্রথম যেদিন শুনিয়াছি

সেদিন হইতে ইহার জের আমরা ক্রমাগত টানিয়া চলিয়াছি কিন্তু দেখিতেছি নাকি রুশো'র মতবাদের Reductio ad absurdum হইতে চলিয়াছে বোলশেভিক্ অনুষ্ঠান? তবে এখানে একটি কথা আছে। ভারতের যে অধিকার তাহা ঠিক ইউরোপের Rights নয়। আমাদের অধিকার অর্থ যোগ্যতা। আর সকল মানুষের যোগ্যতা সমান নহে। এমনও যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় সকল মানুষেরই সমানভাবে যোগ্য হইবার সম্ভাবনা আছে, শুধু দরকার শিক্ষা ও সুযোগ—তবুও বলিতে হইবে এই শিক্ষা ও সুযোগ বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরণের হওয়া উচিত, নতুবা সমান যোগ্যতা মানুষের আসিবে না। কিন্তু এক প্রকার নয় আর এক প্রকার স্তরবিভাগ সকল যুগে সকল সমাজেই যে দেখা দিয়াছে—বর্ণবিভাগ হউক আর শ্রেণীবিভাগ হউক ধর্ম্ম-কর্ম্মের বৈচিত্র্য, এমন কি উচ্চনীচতা যে অতিমাত্র গণবাদী ধর্ম্ম সঙ্ঘের মধ্যেও আসিয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহাই কি প্রমাণ হয় না যে, এই অধিকারভেদ প্রকৃতির একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম, ইহাকে জোর করিয়া অস্বীকার না করিয়া বরং স্বীকার করিয়া ইহার সত্যের উপরই সকল সৃষ্টিকে স্থাপন করাই মানুষের পক্ষে মঙ্গল?

ইউরোপে Rightsএর (বা ন্যায্য দাবীর) যে সাম্যবাদ তাহা আসিয়াছে একটা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার ফলে। শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, ততটুকু জিনিষের উপর সকল

মানুষেরই সমান দাবী। এখানে স্বভাবের বা স্বধর্ম্মের কোন কথা নাই। শরীরকে মুক্ত রাখা, জিয়াইয়া রাখা মানুষমাত্রেরই আদি ও আদিম অধিকার। তাই সমাজশৃঙ্খলার প্রথম সূত্র হইতেছে **Habeas corpus,** আত্মানং সততং রক্ষেৎ। স্বাধীনতার এই ন্যূনতম মাত্রায় যেখানে আঘাত পড়িয়াছে, উৎপীড়িত যেখানে **bread**-এর পরিবর্ত্তে **stone** আস্বাদন করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছে সেইখানেই সমাজের বাঁধন খসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফরাসীবিপ্লবের ইহাই মূল কথা, রুশবিপ্লবেরও ইহাই গোড়ার তত্ত্ব। কিন্তু এইরকম বিপ্লব যতই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত হউক না কেন, ইহারা অন্যায়ের প্রতীকার করিতে যাইয়া আর একটা অন্যায়কে ডাকিয়া আনে, অতিরিক্ত অসাম্য হইতে মানুষকে বাঁচাইতে গিয়া অতিরিক্ত সাম্যের মধ্যে ফেলিয়া পিষিয়া মারিবার উপক্রম করে। আজ আমরা দেশের চাষী মজুরকে উদ্ধার করিতে যাইয়া সমস্ত দেশটাই চাষী মজুরের দেশ বানাইয়া ফেলিতে চাহিতেছি না কি? বোলশেভিক্ রাজত্বে দেশের জ্ঞানীগুণিদের (**Intelligentsia**) অবস্থাই এ কথার প্রমাণ দিতেছে।

জীবনপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক দাবী হিসাবে একটা সাম্যবাদের প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাম্যবাদ যখন তাহার ন্যায্য গণ্ডী, তাহার যথাযথ ক্ষেত্রটি ছাড়াইয়া যায়, আমরা উহাকে যখন প্রয়োগ করিতে চাই মানুষের ধর্ম্মকর্ম্মের, তাহার

প্রকৃতির, স্বভাবের গড়নে তখন প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসি। এ সব ক্ষেত্রে সাম্যবাদ পীড়নের নামান্তর মাত্র। সাম্যবাদের উৎপত্তি হৃদয়ের একটা ভাবে, অনুকম্পায় সহানুভূতিতে। কিন্তু সব মানুষকে সমান ভালবাসিতে গিয়া মানবজাতির মধ্যে সৌভ্রাত্র্য স্থাপন করিতে গিয়া আমরা যে-কথাটি ভুলিয়া যাই তাহা হইতেছে এই যে, ভিতরের ভাব একই রাখিতে গেলে বাহিরের ব্যবহারও যে একই রাখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। স্থান কাল পাত্র হিসাবে প্রয়োগের তারতম্য, পার্থক্য বৈচিত্র্যই যথার্থ সাম্যভাবের পরিচয়।

অধ্যাত্মবাদীই বোধ হয় এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুল করিয়া থাকেন। বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে একই ভগবান, মানুষের আত্মায় আত্মায় একই পরমাত্মা. অতএব কোন ভেদ কোথাও নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—সব সমান, সব একাকার। অতিবড় সাধুও ভগবান, অতিনীচ পাষণ্ডও ভগবান—যা কিছু আছে সবই একই শক্তি, একই সত্তা। এসব কথা সত্য হইলেও ইহা হইতেছে অর্দ্ধেক সত্য। হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ইহা হইতেছে পারমার্থিক সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক সত্য অন্য রকম। ব্যবহারিক জগৎ ভেদের, ব্যষ্টিসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা কিন্তু থাকি ব্যবহারিক জগতে অথচ ব্যবহারিক জগতের সত্য মানিতে চাই না, একান্ত পারমার্থিক সত্য দিয়াই ব্যবহারিক জগতেও কাজ বাগাইতে চাই। ফলে আধ্যাত্মিক জগতেও আমরা

একটা কঠোর একাকার একটা Socialism বা Bolshevism স্থাপন করিয়া বসি। কিন্তু ভগবান এক হইলেও জগৎ নানা, জীবে জীবে শিব এক হইলেও বস্তুতঃ জীবশক্তি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভিন্নতাকে নানাত্বকে দূর করিয়া নয়, তাহাকে সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই ব্যবহার হিসাবে তবে ভগবানের একত্বের লীলায় যোগ দিতে হইবে। সমস্যা যদি কিছু থাকে তবে তাহা হইতেছে এই, সৃষ্টি মানবজাতি অসম, কিন্তু কি রকমে এই অসমকে তালে লয়ে ছন্দযুক্ত করিয়া তোলা যায়। জগতে মানবসমাজে যে অসাম্য আছে তাহা হয়ত বেতাল বেসুর। কিন্তু সে অসাম্যকে সুরে তালে বাঁধিয়া তুলিতে হইলে যে এক ঢালা সাম্য চাই, সকল বিষমতা মুছিয়া ফেলা চাই, এমন কোন প্রয়োজন আছে কি? সঙ্গতের অর্থই হইতেছে ত বিবিধ বিষমের অসমের সামঞ্জস্য।

অন্তরাত্মায় মানুষ এক হইতে পারে, কিন্তু সেই একই অন্তরাত্মার প্রকাশে মানুষ হইতেছে বহুবিচিত্র। সকল নদী একই সাগরে যাইয়া মিশিতে পারে কিন্তু প্রত্যেক নদীর খাত, গতিভঙ্গী, উহার জলের দোষগুণ, উহার তীরস্থ দেশ পৃথক পৃথক ধরণের। মানুষ মানুষ-ভাবে এক হইলেও জাগতিক প্রতিষ্ঠানে ভেদ নানাত্ব, বৈচিত্র্যই হইতেছে আসলরহস্য। যে জাতি. যে সমাজ ধর্ম্মের পার্থক্য অনুসারে অধিকার বৈচিত্র্যের উপর তাহার শিক্ষাদীক্ষা, তাহার জীবন-আয়তন গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বনিয়াদ তত পাকা।

একথা সত্য, হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা ব্যষ্টিবৈচিত্র্যের উপর ততখানি প্রতিষ্ঠিত নয়, যতখানি হইতেছে গোষ্ঠী-বৈচিত্র্যের উপর। কারণ, হিন্দু দেখিয়াছে জীবনশক্তির (life-forces) কতকগুলি সাধারণ ধারা এবং ইহাদেরই সার্থকতার জন্য খুলিয়া দিয়াছে বিবিধ পথ, গড়িয়া দিয়াছে কেন্দ্র, স্তর, শ্রেণী। ইহাতে ব্যষ্টির বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, ব্যষ্টি একটা সঙ্ঘগত চাপের তলে পড়িয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতের প্রশ্নই এইখানে, সঙ্ঘগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্যষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য কি রকমে ফলাইয়া তোলা যায়। আজকাল কার ডেমক্রাসী যে জিনিষটি লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে তাহা এই ব্যক্তিত্বের উদ্ধার—কিন্তু তাহার অর্থ নয় যে সকল ব্যক্তিই একাকার হইয়া উঠিবে অথবা জাতি বা সমাজ হইবে কতকগুলি স্বাধীন সমান বিচ্ছিন্ন পরমাণুর মত ব্যষ্টিসমাহার।

একের বনাম সকলের আধিপত্য

(অটোক্রাশী বনাম ডেমক্রাশী)

ইউরোপীয়েরা প্রায়ই আমাদের মস্ত একটা অভাব ও অযোগ্যতা দেখাইয়া বলিয়া থাকেন যে আমরা গণতন্ত্র কাহাকে বলে কোন দিনই জানি নাই। ডেমক্রাশী জিনিষটি ইউরোপেরই বিশেষত্ব, ইউরোপেরই দান। এসিয়াবাসীরা বোঝে ও জানে কেবল ব্যক্তিগত শাসন (Personal rule), অটোক্রাশী। ইউরোপের হাওয়ায় পড়িয়া আমরাও এ অভিযোগটিকে বড়ই অপমানের চোখে দেখি এবং আমাদের এই কুখ্যাতি স্খালন করিবার জন্য কিছুদিন হইতে আমরাও ইতিহাস পুরাণাদি ঘাঁটিয়া দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, না, গণতন্ত্র—ডেমক্রাশী—আমরাও বুঝি ও জিনিষটা আমাদের দেশেও যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ রকম ব্যস্ত হইবার কোন কারণ আছে কি না দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। আমাদের দেশে ডেমক্রাশী যদি না'ই থাকিয়া থাকে, তাহাতে যে শাসনপদ্ধতি আমাদের পচিয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ কি? বরং এই কথাই আমরা বলিব যে আমাদের ব্যবস্থাপকেরা যদি ডেমক্রাশী অপেক্ষা অটোক্রাশীর উপর বেশী জোর দিয়া থাকেন জনসঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তৃত্ব পছন্দ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন।

আজকালকার ডেমক্রাশীর ধূয়া কতখানি যে শুধু ধূয়ামাত্র, তাহা একটু চোখ মেলিয়া চাহিলেই ধরা পড়ে। ইউরোপ যে তাহার ডেমক্রাশী লইয়া এত বড়াই করে, সে ডেমক্রাশী কোথায় কতটুকু বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াছে বা হইবার পথে চলিয়াছে? সবদেশেই দেখি না কি কর্ত্তা যাহারা তাহারা অতি মুষ্টিমেয় অথবা কেবল একটি ব্যক্তিমাত্র, বহুজনের নামে আপন কর্ত্তৃত্ব ফলাইয়া চলিয়াছে? আমেরিকার এমন যে নাম-ডাক গণতন্ত্র, ফরাসীর যে গৌরবের সাধারণতন্ত্র তাহা ত কেবল কয়েজন মহাশক্তিমান অর্থপতির সম্পত্তি। কাইজার যে একাই অটোক্রোট তা নয়, সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া শাসন করাই যে দেশের মহাধর্ম্ম বিবেচিত, সেই ইংলণ্ড সেই mother of representative institutions সেখানে একা লয়েড জর্জ্জ ত হাতে মাথা কটিয়া আসিতে-

ছিলেন। আর রুশিয়ার "জার"কেই কেবল দোষ দিলে চলিবে কেন, চাষা-ভূষা—Proletariatএর দোহাই দিয়া লেনিন সেখানে কি করিয়াছেন? ইতালীর কর্ত্তা আজ কে? দেশের সর্ব্ব-সাধারণ, না মুসোলিনী (Mussolini) ! মুস্তাফা কামাল না হয় হইতেছেন এসিয়াবাসী এবং এসিয়াবাসীর উপযুক্ত অটোক্রাট তিনি ; গ্রীসে ভেনিজেল্‌স্ কি কম অটোক্রাট, তবে তাঁর ভাগ্য-বিধাতা একটু বাম, এই যা পার্থক্য।

যাহার শক্তি আছে সেই হয় নেতা—সে শক্তি বুদ্ধিবল হউক, ক্ষাত্রবল হউক, আর অর্থবল হউক। সর্ব্বসাধারণের সে শক্তি থাকে না, থাকিতে পারে না। শক্তি আশ্রয় করে একটি ব্যক্তি-কেই, বড় জোর না হয় একটি ক্ষুদ্র দলকে। শক্তি পাইয়াছেন যিনি তিনি সেই শক্তির জোরে আপন প্রতিষ্ঠা করিয়া লন, সর্ব্ব-সাধারণে তাঁহাকে কোথাও ইচ্ছায়, কোথাও অনিচ্ছায় মানিয়া চলিতে বাধ্য। শক্তিমান নেতা যিনি, তিনি চলেন আপনার শক্তিস্ফুরণের পথে, সাধারণের মতামতের অপেক্ষা তিনি বড় রাখেন না। কেহ স্পষ্টই সাধারণকে সোজাসুজি আপনার পথে খেদাইয়া লইয়া চলেন যেমন নেপোলিয়ন আলেকজান্দের—আর কেহ বা একটু রাখিয়া ঢাকিয়া, সর্ব্বসাধারণের দোহাই দিয়া চলেন আপনারই লক্ষ্যে ও পথে—যেমন অগষ্টাস্ সীজার। ডেমক্রাসীর কথা উঠিলেই সকলের মনে আদর্শস্বরূপ ফুটিয়া উঠে সেই প্রাচীন

আথেন্সের গণতন্ত্র (Athenian Democracy) ; কিন্তু বস্তুতঃ আথেন্সের ডেমস্‌কে (Demos) চালাইয়াছেন আথেন্সের যাঁরা ছিলেন aristos, শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। আর ইঁহাদের মধ্যে যখন যিনি নেতার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তখন তিনি ফলাইয়াছেন আপনার অবাধ কর্তৃত্ব। প্রাচীন রোমেও সেনেটের (Sanate) আজ্ঞা বস্তুতঃ নির্দ্ধারণ করিতেন যিনি হইতেন Cousul বা Imperator.

একচ্ছত্র প্রভুত্বের, যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে জনসঙ্ঘ আপনার ইচ্ছাকে জোর করিয়া দাঁড় করায় না, তাহা নহে। কিন্তু সে জনসঙ্ঘের মুখপাত্র হইয়া দাঁড়ায় একজনই। আর একবার এই একজন যখন নেতা হইয়া উঠেন তখন তিনি আর জনসঙ্ঘের মতামতের ধার ধারেন না, তিনি চলেন, আপন খেয়ালমত, জনসঙ্ঘ —ভয়ে হউক আর ভক্তিতে হউক—তাঁহার একাধিপত্য মানিয়া লয় ও তাঁহার সব্বকার্য্যে সায় দিয়া চলে, অন্ততঃ যতদিন আর-একজন শক্তিশালী পুরুষ তাঁহার স্থান না অধিকার করিয়া বসে। ফরাসী বিপ্লবের মত জনসঙ্ঘের বিপুল উত্তাল উত্থান ইতিহাস আর দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই ফরাসী বিপ্লবের ধারা কয়েকটি শক্তিমান পুরুষের একাধিপত্যের ক্রম ছাড়া আর কি? মিরাবো, দান্তন, রোব্‌সপীয়ের—এই ত ফরাসী বিপ্লব।

এই ব্যাপারটির হেতু যথেষ্টই আছে এবং তাহা ধরিতে খুব বেগ পাইতে হয় না। প্রথমতঃ জনসঙ্ঘের শক্তি হইতেছে অন্ধ-

শক্তি, এবং সে অন্ধশক্তিও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। একটি বিশেষ মানুষের মধ্যেই শক্তি সংহত হইয়া উঠে ও পায় জ্ঞানের বুদ্ধির নিরিখ।

বহুজনের শক্তি বহুমুখী, তাহাদের মত ও পথ পরস্পর পরস্পরের সহিত আড়াআড়িভাবেই চলে—সেখানে একটা বিশেষ স্থির সিদ্ধান্ত যেমন সহজে হয় না, তেমন কোন রকমে একটি সিদ্ধান্ত হইলেও তাহা কার্য্যকরী করিবার মত একটা একমুখী শক্তির চাপও অনায়াসে মিলে না। শক্তিমান পুরুষ আসেন তাঁহার সজাগশক্তি লইয়া এবং একটা স্থির লক্ষ্য লইয়া—তাই তিনি নানামতের সন্দেহ দোলায় দুল্যমান লোকচিত্তকে বিনা কষ্টেই অধিকার করিয়া বসেন ও লোকের বিচার বুদ্ধির চেষ্টাকেও তাঁহার শক্তির সম্মোহন দিয়া পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলেন। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সামর্থ্য থাকে না—মনে হয়, যাহা করিতেছেন তাহাই ঠিক, আমরাই বুঝিতেছি না। গান্ধীজী ত আমাদের দেশে ইহাই করিয়াছেন—তিনি নিজের শক্তিবলে Dictator হইয়াছিলেন, আমরা পরে যে সকলে মিলিয়া তাঁহার এই পদটি মঞ্জুর করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের কর্ত্তৃত্ব কিছু প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় আমাদের অকুণ্ঠ ভক্তি। প্রাচীন রোমে যে আপদকালে Imperator "মনোনীত" হইত তাহাও কমবেশী এই রকমেই হইত।

নেতা যিনি তিনি হইতেছেন সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি, সর্ব্ব-

সাধারণের অনুমতিক্রমে, হুকুমেই তিনি নেতা, যতক্ষণ তিনি হুকুম তামিল করিতেছেন, ততক্ষণই তিনি নেতা, যে মূহূর্ত্তে তিনি সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা এদিকে ওদিকে চলিয়াছেন সেই মূহূর্ত্তেই তিনি তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অধিকার হারাইয়াছেন - ডেমক্রাশীর এই যে শাস্ত্র, তাহা শাস্ত্র হিসাবে যতই নির্দ্দোষ হউক না কেন, কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের সম্ভাবনা খুবই বিরল। এই শাস্ত্র একটা আদর্শ হইতে পারে কিন্তু মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। লোকে যে একজন নেতা চায় তাহার কারণ ইহা নয় যে হুকুম তামিল করিবার জন্য লোকের দরকার একজন যোগ্যব্যক্তি, তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি। লোকে নেতা চায় হুকুম শুনিবার জন্য, নিজের ইচ্ছা জানিবার জন্য। লোকে যখন বোঝে না কি ঠিক করিতে হইবে, যখন ভাল রকম ধরিতে পারে না নিজের ইচ্ছা কি, তখনই সে নেতার শরণাগত হয়। আর তাহারা সেই নেতাকেই বরণ করিয়া লয় যিনি আপন শক্তিতে পূর্ব্ব হইতেই আপন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্বেচ্ছায় নেতৃবিশেষকে পছন্দ করিয়া লওয়া হইতেছে লোকের একটা মনের ভ্রম—আত্মপ্রসাদ পাইবার জন্য একটা আত্মপ্রবঞ্চনা-পূর্ণ ধারণা। নেতারও অনেক সময়ে ধারণা হয় যে তিনি নিজে কিছু নহেন, তিনি সাধারণের দাস মাত্র, সাধারণে তাঁহাকে চাহিয়াছে তাই তিনি অযোগ্য হইলেও নেতার আসন নেহাৎ

অনিচ্ছাসত্ত্বে গ্রহণ করিয়াছেন—নেতার এই বিনয়ের মধ্যেও রহিয়াছে একটা আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা। নেতার শক্তিই জোর করিয়া নেতাকে লোকের মাথার উপরে বসাইয়া দিয়াছে—শেক্সপীয়রের কথায়, Greatness has been thrust upon him.

আরও একটি কথা আছে। নেতা যে কেবল শক্তির জোরেই সাধারণের উপরে নিজের প্রতিষ্ঠা করেন তাহা নহে, অথবা আপনার অযোগ্যতা অনুভব করিয়াই যে সাধারণে একজন যোগ্য নেতাকে কর্ত্তব্যের দিশারী বলিয়া মানিয়া লয়, তাহা নহে। সমাজে অটোক্রাট যে উচ্চস্থান পায় তাহার আরও কারণ আছে। সব অটোক্রাট সব সময়ে যোগ্য নয়, এমন অটোক্রাটও আছে যে স্পষ্টই লোকমতকে অগ্রাহ্য করিয়া, সাধারণকে উৎপীড়িত করিয়াই চলে; অথচ সহসা লোকে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চায় না,—পারে না বলিয়া যে চায় না তাহা নয়, অনেক সময়ে ইচ্ছা করিয়াই চায় না, চাহিতেই প্রাণ সরে না। অর্থাৎ অটোক্রাটের ভিতরের সারবস্তু সে যাচাই করে না, অটোক্রাটের নামের ঠাটের উপরই তাহার আছে কোথায় একটা নিবিড় নিগূঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা। এটা যে কেবল চাটুকারের বৃত্তি, তাহা নয়—সে হিসাবে সর্ব্বসাধারণই হইতেছে এক রকমে চাটুকার। ইংলণ্ডের রাজার কি ক্ষমতা, দেশের নেতৃত্বে তাঁহার কতখানি বাস্তব অধিকার? ইংরাজের

গর্ব্বই এই যে তাহার অটোক্রাট হইতেছে "ঠুঁটোজগন্নাথ" লোক-মতই হইতেছে সেখানে সর্ব্বশক্তিমান। অথচ এই ইংলণ্ডে, বর্ত্তমানের এই ঘোর ডেমক্রাশীর যুগেও দেখিতে পাই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভারতবর্ষে যে সম্রাটের নাম খুব ফলাইয়া জাহির করা হয়, তাহা স্পষ্টই রাজনীতিক উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু খোদ ইংলণ্ডেও যখন দেখি রাজকীয় কোন ব্যাপার—অভিষেক, বিবাহ ইত্যাদি বড় বড় ব্যাপারের ত কথাই নাই, এমন কি ছোট নগণ্য ব্যাপার পর্য্যন্ত, যথা, প্রিন্স আজ একটু মুচ্‌কি হাসিয়াছেন—বিপুল ডঙ্কায় ঘোষিত হইতেছে ; হাটে, বাটে, মাঠে তাহা দেখিবার জন্য লোকের ভীড় লাগিয়া গিয়াছে ; ফটোগ্রাফে বায়োস্কোপে, খবরের কাগজে তাহা তুলিয়া ধরিয়া হৈ হৈ রৈ রৈ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; তখন কি আমাদের বুঝিতে হইবে ? এ ব্যাপারকে কি কেবল একটা নিরর্থক কৌতূহলের হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় ? বড় কাহাকেও পূজা করিয়া মানুষ যে আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাহার হেতু এই যে, বড়কে পূজা করিয়া মানুষ ভিতরে একটা বড়ত্বই অনুভব করে, সে-বড় যে রকমই হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। শক্তির, সৌন্দর্য্যের, ঐশ্বর্য্যের একটা আদর্শ সব মানুষের ভিতরেই লুক্কায়িত আছে। কিন্তু এ আদর্শ সব মানুষের পক্ষে নিজের জীবনে ফলান সম্ভব হয় না। তাই যেখানে যেভাবে যতটুকু ইহার ছায়া সে দেখিতে পায়,

তাহা সাচ্চা হউক আর ঝুটা হউক—সেইখানেই সে অনুভব করে নিজেরই গুপ্ত সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন মূর্ত্তি পাইতেছে। তাই এই গৌণ—vicarious—সার্থকতায় তাহার এত আনন্দ এত উল্লাস। চাটুকারের আসল মনস্তত্ত্ব এইখানে—সে যে কেবল নিজ সুখ সুবিধার জন্য "জলুকাৎ" করিয়া চলে তাহা নয়, বড়'র মধ্যে নিজেরই একটা বড়ত্ব প্রতিফলিত হইতেছে সে অনুভব করে, এই "আত্মনঃ কামায়" তাহার বড়র উপর ভক্তি শ্রদ্ধা।

অটোক্রাশী—একের স্বৈরাচার - যে সম্ভব হয়, শুধু সম্ভব নয়, সমাজে অবশ্যম্ভাবী—তাহার কারণ এই যে ও-জিনিষটির মূল সর্ব্বসাধারণের—Demos-এরই—অন্তঃকরণের মধ্যে। অটোক্রাশী জগতের মঙ্গল করিয়াছে বেশী, কি অমঙ্গল করিয়াছে বেশী, প্রশ্ন করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু এ প্রশ্নও করা যাইতে পারে, ডেমক্রাশী জগতের মঙ্গল বেশী করিবে কি অমঙ্গল বেশী করিবে। কিন্তু এ সমস্যা এখানে উত্থাপন করিবার দরকার নাই আমরা এইটুকু কেবল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অটোক্রাশী কেবল এসিয়ার বিশেষত্ব নয়, ওটি ইউরোপেও যথেষ্ট মিলে; ও জিনিষটির ভিত্তি মানুষের মনের গভীরে এবং উহা সমাজ মাত্রেরই অব্যর্থ অনুসঙ্গী।

২

একের আধিপত্য ভাল, না সকলের আধিপত্য ভাল? ভালমন্দের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া আমরা দেখিয়াছি যে সকলের আধিপত্য জিনিষটা বর্ত্তমানের মানব-সমাজে সম্ভব নয়, বাস্তবজগতে আধিপত্য যদি কাহারও সম্ভব হয় তবে তাহা হইতেছে একেরই। এমন কি বিশেষ দল বা সঙ্ঘের যদি আধিপত্য কোথাও থাকে, তবে সে আধিপত্যেরও মূল হইতেছে এক ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি হইতেছেন সেই দল বা সঙ্ঘের নেতা। পক্ষান্তরে যেখানেই দেখিব সকলের আধিপত্য, যেখানে কোন বিশেষ ব্যক্তির নেতৃত্ব নাই, সেখানে বাঁধন নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেখানে সবই বিপুল গোলমাল। অরাজকতা অথবা ইংরাজী anarchism কথার মৌলিক অর্থও তাই অর্থাৎ যেখানে নাই রাজা, নাই archon (প্রধান, নেতা বা কর্ত্তা)।

একের শাসনই (autocracy বা despotism) হইতেছে সমাজ-শৃঙ্খলার মূল সত্য। তবে ডেমক্রাশী জিনিষটা কি? ওটি কি একেবারেই ভূয়ো জিনিষ! প্রথমতঃ ডেমক্রাশী হইতেছে অটোক্রাশীর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ—উহা ব্যতিরেকী (nega-

tive) শক্তি, উহার কাজ হইতেছে অটোক্রাশীর শক্তিকে সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা। একের আধিপত্য হইয়া উঠে যখন একের অত্যাচার (মূল গ্রীক কথা despotes ও turanos অপভ্রংশে হইয়া পড়ে যখন ইংরাজী despot ও tyrant) তখন অত্যাচারিত সকলে মিলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় যে বিদ্রোহের মন্ত্র লইয়া তাহাই ডেমক্রাশীর মন্ত্র। একের শক্তি সকলের শক্তিকে চালাইয়া লইতেছে বটে, কিন্তু চালাইয়া লইতে লইতে সে যদি সকলকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলে তবে পরিশেষে এমন একটা স্থান কাল আসিতে বাধ্য যখন সকলে আর এককে মানিয়া চলিতে চায় না, চায় তাহার বিরুদ্ধেই চলিতে। এক যিনি, কর্ত্তা বা despot যিনি তিনি যতই শক্তিমান হউন মোট সমাজশক্তির তিনি হইতেছেন একটা দিক, আর একটা গোটা দিকই হইতেছে লোকসাধারণ। আর এই লোকশক্তি যতই অবোধ নির্ব্বোধ মূক পঙ্গু হউক না কেন তাহার আছে অন্ততঃ বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার আবেগ, আছে সুখের, স্বস্তির ব্যষ্টিগত একটা স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা ও স্বার্থকতার উপর অনুরাগ ও স্পৃহা। এই আবেগ, এই অনুরাগ, এই স্পৃহা—একদিন কি দুইদিন ভুলিয়া থাকিলেও, চিরকালের জন্য কর্ত্তাদের ইচ্ছার কাছে গণসঙ্ঘ বলি দিবে না। পাশ্চাত্যের একজন মনীষীর কথায় বলা যাইতে পারে, কর্ত্তা সকল মানুষকে কতক সময়ের জন্য বোকা বানাইতে পারেন বা কতক মানুষকে সকল সময়ের জন্য

বোকা বানাইতে পারেন কিন্তু সকল মানুষকে সকল সময়ের জন্য বোকা বানাইতে পারেন না (You may fool all men for some time, or some men for all time but never all men for all time). কর্ত্তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাঁর আধিপত্যের একটা সীমাও আছে, সে সীমাটি অতিক্রম করিয়া যাইবার তাঁর অধিকার নাই, সামর্থ্যও নাই। গণতন্ত্রবাদ সমাজে দেখা দিয়াছে এই জন্যেই একের আধিপত্যের কবল হইতে বহুর সকলের অধিকারকে উদ্ধার করিতে, রক্ষা করিতে।

শুধু এইটুকুতেই যদি নিরস্ত হওয়া যাইত তবে ডেমক্রাশীর সার্থকতা না হয় বুঝিতাম; কিন্তু তাই নয়, ডেমক্রাশীর গোঁড়া ভক্তেরা বলিয়া থাকেন যে ও-জিনিষটি আরও গভীর সত্যের ও সামাজিক প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত। নেতা যিনি, কর্ত্তা যিনি তিনি নিজের শক্তির তৃপ্তির জন্য যাহাই করুন না কেন, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার শক্তি হইতেছে গণশক্তিরই প্রকাশ, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে ইচ্ছা যে আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত নেতা সেইটিই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতেছেন মাত্র, রাজা তাই প্রজার প্রতিনিধি—প্রজা ছাড়া রাজার পৃথক সত্তা নাই। লোকশক্তিরই উপর নির্ভর করিয়া অটোক্রাটের শক্তি, অটোক্রাট সে কথা না বুঝিতে পারেন, মায়ার বশে তিনি হয়ত নিজের শক্তিকে একান্ত নিজেরই বলিয়া ধারণা করিতে পারেন—কিন্তু ইহা তাঁহার একটা বিষম ভুল। নেপোলিয়ন হয়ত

বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত শক্তিতেই তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন, ফরাসী দেশ সারা ইউরোপ তাঁহারই উপচয়ের খোরাক জোগাইতেছে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ইতিহাসের গোপন কর্ম্মের ধারা যাঁহারা একটু তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে নেপোলিয়ন একটা নাম মাত্র, সে নামের ভিতরকার বস্তু হইতেছে ফরাসীর ইউরোপের তদানীন্তন কালের একটা আকাঙ্ক্ষার ইষণার কেন্দ্রীভূত শক্তি। Vox populi, Vox dei—আর গণসজ্যের সেই বাণী মূর্ত্ত হইয়াছে যে এক আধারে তাহাকেই বলি নেতা, কর্ত্তা। এথেন্সের ডেমক্রাশী এত প্রসিদ্ধ এই জন্যই যে এখানে এই Vox populi এক রকম সর্ব্ব-নিয়ন্তা ছিল, তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নামের তোয়াক্কা রাখে নাই। নেতা বিশেষের অত্যধিক স্বেচ্ছাচারকে দমনে রাখিবার জন্য গণশক্তি সেখানে Ostracism প্রথা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং সেখানে অমন অটোক্রাট খুব কমই ছিলেন যিনি একবার না একবার এই গণমতের কাছে লাঞ্ছিত হন নাই—Aristides, Themis-tocles, Alcibiades এথেন্সের এই দিকপাল সবও সাধারণের দুয়ারে বিচারিত নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

তারপর প্রকৃত অটোক্রাশী—একের শাসন হইতেছে সমাজের প্রথম অবস্থার ব্যবস্থা। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র গোড়ায় রোমেও ছিল গ্রীসেও ছিল। কিন্তু সমাজ যখন দানা বাঁধিয়া উঠিল, ক্রমে

লোকশক্তি ও লোকমতের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সে ব্যবস্থাও লোপ পাইল। রোমে শেষে "সীজার"দের আবির্ভাব হইয়াছিল, গ্রীসেও শেষে আলেকসান্দের দেখা দিয়াছিলেন—সত্য কথা। তাহা হইলে, উপরের সূত্রটী আরও একটু ব্যাপক করিয়া বলা যাইতে পারে অটোক্রাশী হইতেছে সমাজের প্রথম ও শেষ অবস্থার ব্যবস্থা। সমাজ যখন গড়িয়া উঠিতেছে আর সমাজ যখন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তখনই অটোক্রাট নিজের জায়গা করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়া থাকেন। ফরাসী দেশে, জর্ম্মণীতে রুষিয়াতে শেষ অবস্থাতেই অটোক্রাশীর চূড়ান্ত হইয়াছে—তাহারা সব মরিয়া বাঁচিয়াছে অটোক্রাশীর পরিবর্ত্তে ডেমক্রাশীর জন্ম দিয়া। ইংলণ্ডকেও নবজন্ম দিয়াছে—যে গণশক্তি ক্রমওয়েলকে মুখপাত্র করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল টিউডর (Tudor) অটোক্রাটদের Divine Right এর বিরুদ্ধে।

এ কথার মর্ম্ম এই যে, সমাজের সুস্থ সবল পূর্ণাবয়ব সাবালক অবস্থার স্বাভাবিক ব্যবস্থা হইতেছে গণতন্ত্র। আর এই গণতন্ত্র নাই যে সমাজে দেখিব, সেখানেই বুঝিব যে সমাজের হয় শৈশবাবস্থা অথবা বার্দ্ধক্যাবস্থা। এসিয়ার জাতি সব কোন দিনই যে অটোক্রাশী ছাড়া আর কিছু বুঝিল না তাহার কারণ এই যে, তাহার সমাজ সব এখনও আদিম অবস্থায়। এসিয়ার মধ্যে এক জাপানই এই আধুনিক কালে সাবালক হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক

সেখানেও দেখিতে পাই তাহার মিকাডোকে প্রায় দারুভূত করা হইয়াছে।

সমাজ সাবালক, এ কথার অর্থ এই যে, সমাজের মধ্যে ব্যষ্টি-শক্তির উদ্বোধন হইয়াছে, ব্যক্তি সংগ্রহের মধ্যে জাগিয়াছে আত্মবোধ—এমন একটা হাওয়া সেখানে দিয়াছে যাহাতে করিয়া প্রত্যেকেই—জ্ঞানতঃ না হউক—অনুভব করে যে সমাজের মধ্যে তাহার আছে বিশিষ্ট স্থান, বিশিষ্ট অধিকার বিশিষ্ট কর্ত্তৃত্ব। সমাজের মনের ধারা যখন এই রকম তখন যে সেখানে আটোক্রোট থাকিতে পারে না, সেখানে স্থান হয় কেবল প্রতিনিধির। সাধারণের অজ্ঞানের উপর অটোক্রোশী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিন্তু ডেমক্রাশীর প্রতিষ্ঠা হইতেছে সাধারণের জ্ঞানের উপর। সাধারণের জ্ঞান জগতে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাই ভবিষ্যতের সমাজ-ধর্ম্ম হইতেছে নিছক ডেমক্রাশী; আর সাধারণের এই জ্ঞানকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্যই বর্ত্তমানে ডেমক্রাটিক প্রতিষ্ঠানাদির প্রয়োজন ও সার্থকতা।

ডেমক্রাশীর সমর্থন আমরা যথাসম্ভব করিলাম, আমরা দেখিতে চেষ্টা করিলাম এই মতবাদের অন্তরের ধারাটি কোন্ ভাবে কোন্ দিকে চলিয়াছে। কিন্তু ডেমক্রাশীর পক্ষে যত কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে কল্পনার জন্য কতখানি তাহাও দেখিবার বিষয়। ভবিষ্যতের আদর্শ হিসাবে ডেমক্রাশী অতি চমৎকার;

জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু মানুষের সমাজ যে-ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, মানুষের স্বভাব যে ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার যতদিন পরিবর্ত্তন না হয় ততদিন ডেমক্রাশী একটা কাল্পনিক ব্যাপার ছাড়া বেশী কিছু নয়। অটোক্রাশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উহার যে কার্য্যকারিতা থাকুক না কেন, সমাজের একটা পাকা ব্যবস্থা হিসাবে উহার স্থান বাস্তবে খুবই অকিঞ্চিৎকর। বলা হয় ডেমক্রাশীতে কর্ত্তা হইতেছে লোকের প্রতিনিধি। কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায়—যেখানে ডেমক্রাশীর এত নাম, এত সম্মান—সেখানে লোকে কি রকম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতেছে? লয়েড জর্জ্জ কি ইংলণ্ডের যথার্থ প্রতিনিধি ছিলেন, না পঁয়করে (Poincare) ফরাসী জাতির প্রাণের আদর্শ? যাহার আছে অর্থবল, ছল, কৌশল তিনিই দেখি লোকের প্রতিনিধি হইয়া বসিতেছেন আর তাই এই রকম প্রতিনিধি প্রত্যহই বদলাইতেছে। যাঁহারা জ্ঞানী গুণী তাঁহাদের স্থান দেশের শাসন কার্য্যে কোথায়? লোকেরা কি দেশের আসল মানুষকে প্রতিনিধি রূপে নির্ব্বাচিত করিতেছে, না করিতে পারিতেছে?

জনসঙ্ঘের জ্ঞান বাড়িতেছে, আত্মকর্ত্তৃত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে—কোথায়? আমাদের মনে হয় আজকালকার জনসঙ্ঘ প্রাচীন কালের জনসঙ্ঘ হইতে খুব বেশী নূতন রকমের জীব নয়। তাহাদিগকে যে যে পথে লইয়া যাইতে পারে তাহারা সেই পথেই

চলে। সেক্সপীয়র প্রাচীন রোম নগরীর জনসঙ্ঘের যে চিত্র দিয়াছেন (Julius Ceasar নাটকে) তাহা সকল জনসঙ্ঘের সনাতন চিত্র। লয়েড জর্জ্জ ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হইতে পারিয়াছিলেন অথবা—ছোট জিনিষের সাথে বড় জিনিষের উল্লেখ করিয়া একজন যথার্থ প্রতিনিধির কথাই যদি ধরি—থেমিষ্টক্লিজ (Themistocles) গ্রীসের প্রতিনিধি হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ ইহা নয় যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে পছন্দ করিয়া মুখপাত্র করিয়া লইয়াছিল, তাহার কারণ ইহাই যে, তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি দিয়া (ছলে ও বলে) তাঁহাদের দেশের লোককে সম্মোহিত করিতে পারিয়াছিলেন। সে সম্মোহন স্থায়ী না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে কথা আলাদা। তাঁহারা নেতা, অটোক্রাট হইয়াছিলেন নিজের জোরে।

তবে এ কথা স্বীকার করা যায় যে অটোক্রাশীকে ভাঙ্গিবার ক্ষমতা জনসঙ্ঘের আছে। কিন্তু এই ভাঙ্গা অর্থও পরিবর্ত্তন করা মাত্র—একজন আটোক্রাটের হাত হইতে আর একজন অটোক্রোটের হাতে পড়া। কিন্তু ভাঙ্গা নয় গড়ার ক্ষমতা জনসঙ্ঘের আছে কিনা সন্দেহ। সকল দেশে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সব দেখা দিয়াছে অটোক্রাটের আমলে। ইংলণ্ডে এলিজাবেথের যুগ, ফরাসী দেশে চতুর্দ্দশ লুই'র যুগ, প্রচীন কালে রোমে অগষ্টাস্ সীজারের যুগ, আর গ্রীসে পেরিক্লিজের যুগ, আমাদের দেশে মোগল সম্রাটদের

যুগ, তারও আগে গুপ্ত সম্রাটদের যুগ—কি প্রমাণ দিতেছে? ইঁহাদের সকলেই এক একজন কি দারুণ অটোক্রাট নহেন?

ফলতঃ অটোক্রাট যিনি—অর্থাৎ শক্তির কেন্দ্র যে কর্ত্তা তিনি তাঁহার অধিকার পাইয়া থাকেন সর্ব্বসাধারণের, জনসঙ্ঘের নিকট হইতে নহে, কিন্তু আরও একটা বৃহত্তর উৎস হইতে, ভগবান হইতেই। অটোক্রাটের শক্তি—ভাল'র জন্য যেমন ব্যবহৃত হইতে পারে তেমনি মন্দের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে—কিন্তু উভয়ত্রই তাহার মূল রহিয়াছে প্রকৃতির একটা অটুট প্রয়োজনের মধ্যে। তাই ভগবান গীতায় বলিতেছেন "শ্রীমৎ" হউক আর "উর্জ্জিত" হউক—উভয় প্রকার শক্তিমান পুরুষই তাঁহার বিভূতি, তাই ত রাজার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া আমাদের শাস্ত্র বলিতেছে—

"সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।"

তবে কি লোকের কর্ত্তব্য কেবল যথেচ্ছাচারী রাজার, অটোক্রাটের সকল কাজে সর্ব্বদা সায় দিয়া চলা? লোকের কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্যের কথা আমরা কিছু বলিতেছি না, আমরা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে লোকে অটোক্রাটের কাজে সায় দিয়াই স্বভাবতঃ চলিয়া থাকে এমন কি আধুনিক জগতে যেখানে ডেমক্রাশীর সব চেয়ে বেশী প্রভাব সেখানেও ডেমক্রাশী হইতেছে অটোক্রাশীর নামান্তর।

হিন্দু শিল্পে অশ্লীলতা

বহু প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের গায়ে অতি উৎকট রকমের শৃঙ্গার-লীলার চিত্র অঙ্কিত আছে দেখা যায়। কোণারক, কামাখ্যা, আবু পাহাড় এই বিষয়ে যে চূড়ান্ত অশ্লীলতা দেখাইয়াছে তাহাতে আমরা আধুনিকেরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাই, লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়। দুই একখানা চিত্র এখানে ওখানে যদি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আদি রসাত্মক হইয়া পড়িত, তাহাও না হয় কোন রকমে বুঝিতে পারিতাম—বলিতাম ওটি শিল্পীদের একটি স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যের ফল। কিন্তু তাহা ত নয়। এ ধরণের ছবি যেখানে আছে, সেখানে দুই একখানা নয়, প্রচুর পরিমাণে, একেবারে ছড়াছড়ি হইয়া আছে। শুধু এই চিত্রগুলি ফলাইয়া

দেখানই যেন ছিল শিল্পীদের মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপর আরও কথা। লৌকিক (ইংরাজীতে যাহাকে বলে profane) শিল্পে অশ্লীলতার স্থান একটা না হয় মানিয়াও লইতে পারি। কালিদাসে "শৃঙ্গার-তিলক" অশ্লীল বলিয়া বিশেষ আসে যায় না। কিন্তু মন্দিরের গায়ে অশ্লীল চিত্র তাহা আবার যেমন তেমন অশ্লীল নয়, অশ্লীলের পরাকাষ্ঠা এ ব্যাপারটা কি? মন্দিরের গায়ে তবুও চিত্রগুলি যদি আঁকা হইত একটু আড়ালে আবডালে লোকের দৃষ্টি যাহাতে সহজেই না পড়ে, তাহা হইলেও মার্জ্জনার বিষয় হয়ত হইত। কিন্তু এ কি! মন্দিরের গায়ে বলিতে দেখি ঠিক তোরণের আশে-পাশে,— দূরে উঁচুতে নয়, একেবারে ভিত্তি গাত্রে! অর্থাৎ কথাটা হইল এই, মানুষ যেখানে সমবেত হয় ধর্ম্মভাব লইয়া ধর্ম্মভাবের উদ্বোধনের জন্য প্রাকৃত বৃত্তি নয় কিন্তু শুদ্ধতর বৃত্তিকে আবাহন করিতে—নির্ম্মল মনোভাব ধরিয়া, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ধারাকে পিছনে ফেলিয়া, যথাসাধ্য ভুলিয়া গিয়া মানুষ যেখানে চায় অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য সুন্দরের মঙ্গলের শুভ্রের শুচির পূজা করিতে, ঠিক সেখানে প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে শলাকার মত বিঁধিতেছে এই সব কুৎসিত পাশব বীভৎস চিত্র।

এই প্রহেলিকার অর্থ কি? তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের ধরিতে হইবে সকল শিল্পের মূল রহস্যটি। শিল্পের প্রতিষ্ঠা আনন্দ। শিল্প দেখাইতেছে আনন্দের ছন্দ। আনন্দের উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত

হইয়া পড়িয়া ধরিতেছে যে রূপায়ন তাহাকেই বলি সুন্দর। সৌন্দর্য্য আনন্দের বিগ্রহ। এখন, কোন্ আনন্দ সকল আনন্দের মূল, কোন্ আনন্দ মানুষের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা গোচর, সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র? মৈথুনানন্দ নহে কি? কথাটি রুচিবাগীশদের কর্ণপীড়া রোমহর্ষ জন্মাইতে পারে। নানা কারণ সংযোগে আমরা সকলেই ইদানীন্তনকালে রুচিবাগীশ হইয়া পড়িয়াছি—কিন্তু শিল্পীর কাজ গোড়াকার সত্য লইয়া, তাঁহার চোখের পর্দ্দা থাকিলে চলে না। সমস্ত সৃষ্টি যে প্রকৃতি পুরুষের রাসলীলা, শারীর মিলনের ফলেই যে বিশ্ব নিত্য বিকশিত মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে—শিল্পী যিনি, কবি যিনি অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা যিনি তিনি ত এই মহা সত্যকে রাখিয়া ঢাকিয়া দেখিতে বা দেখাইতে পারেন না। সমস্ত বিশ্বের ছন্দ গোড়ার দিক হইতে দেখিলে কামানন্দের ছন্দ ছাড়া আর কি? মহাকবি কালিদাস তাই মানব মানবীরও গণ্ডী পার হইয়া দেখিতেছেন, ঐ যে মৃগ মৃগীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেছে, বনজ্যোৎস্না সহকারকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া লতাইয়া উঠিয়াছে—আর ঐ যে নদী সাগরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, সে ত নিবিড় চুম্বন প্রতিচুম্বনের লীলা "পিবতি পাবয়তি চ সিন্ধুঃ"।

আজকাল ইউরোপেও বিজ্ঞানের দিক হইতে প্রকৃতির এই তলাকার তত্ত্বটি খুঁড়িয়া তুলিয়া গোচর করিয়া ধরিবার চেষ্টা হইতেছে। 'ফ্রয়েড' প্রমুখ মনীষীবৃন্দ মানুষের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম,

ইষণা ও প্রেরণা ভাঙ্গিয়া সরল করিয়া তাহার মধ্যে গোড়ার বনিয়াদরূপে আবিষ্কার করিতেছেন নিভাজ যৌনবৃত্তি। তাঁহারা বলিতেছেন মানুষের যে সমুদয় বৃত্তিকে আমরা উচ্চতর শুদ্ধতর মহত্তর অভিধা দিয়া ভূষিত করি—প্রেমপ্রীতি, কল্পনা কবিত্ব, এমন কি ধর্ম্মভাব পর্য্যন্ত সে সকল এই যৌনবৃত্তিরই রকমফের। এই বৃত্তিটিকে একটু পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া, রঙাইয়া সাজাইয়া যখন ধরি, তাহার সেই পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত মূর্ত্তিই তখন ভিন্ন নামে ভদ্রসমাজে, উচ্চশ্রেণীতে উন্নত আসন পাইয়া থাকে। সুতরাং এই যে সকল বৃত্তির মূল বৃত্তি ইহাকে একান্ত হেয় বিবেচনা করিবার কোন কারণই নাই।

বিজ্ঞান চাহিতেছে বাহিরের ক্রিয়াবলীর যে আবরণ তাহার অন্তরালে খেলিতেছে কি নিত্য সত্য নিত্য শক্তি সেই সব আবিষ্কার করিতে, শিল্প সেই সব নিত্য সত্য নিত্য শক্তিকে দেখিতেছে ও দেখাইতেছে রসের সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি হিসাবে। সত্য—যে স্তরেরই হউক না কেন, মানুষের বা প্রকৃতির যত গোপন তলের জিনিষ হউক না কেন—তাহা যে কুৎসিত হইবেই এমন কোন কথা নাই। সত্য চির-সুন্দর **Truth is Beauty**; জিনিষ সুন্দর কি কুৎসিত তাহা নির্ভর করে দেখিবার ও দেখাইবার ভঙ্গীর উপর। সত্য সত্য, কারণ তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ; আর বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ হয় নিজের ভিতরকার আনন্দকে, আনন্দের সামর্থ্যকে ধরিয়া। সত্যের এই

আত্মস্থ আনন্দময় শক্তিকে কবি শিল্পী সাক্ষাৎ করিয়াছেন, প্রকট করিয়াছেন প্রকৃতির বিশ্বসৃষ্টির একটা মূলতত্ত্ব যে মৈথুন তাহারও মধ্যে।

কিন্তু ধর্ম্মসাধনার সাথে যৌনসাধনার সম্বন্ধ কি? মন্দিরের গাত্রে পাশব বৃত্তির ছবি আঁকিয়া কি সার্থকতা? ইতিপূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি লৌকিক শিল্পে শৃঙ্গারের স্থান একটা আছে না হয় স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু পারমার্থিক শিল্পে তাহা কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে? প্রথম কথা, শিল্পজগতে লৌকিক ও পারমার্থিক বলিয়া দুইটি পৃথক শ্রেণী আছে কি না সন্দেহ। আর বস্তুজগতেও অন্তরতমের সমুচ্চের দিক হইতে দেখিলে এই দুইটি জিনিষের পার্থক্য দেখি ঘুচিয়া গিয়াছে। ইউরোপের নব মনস্তত্ত্ববিদেরা যে সত্য দেখিতে সুরু করিয়াছেন, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা সেই সত্যকে দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে কামানন্দ ও তুরীয়ানন্দ এক জিনিষেরই দুই পিঠ। আত্মায় সৎপুরুষে যে আনন্দ তাহা যখন নিরেট ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায় স্থূলে জড়স্তরে তাহার নাম দেহজ সুখ; আর স্থূল ইন্দ্রিয়ের আনন্দ যখন আপনার মধ্যে আপনি ডুবিয়া গিয়া স্বচ্ছ উজ্জ্বল রূপান্তর পায় তখনই তাহাকে বলি আত্মরতি, ভূমৈব সুখং।

দেহের সহিত দেহের যে নানাভঙ্গিম রতিবিলাস তাহা আত্মার সহিত আত্মার—নিজের সহিত নিজের যে বৈচিত্র্যময় ঐক্য তাহারই

প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। উভয়ে মূলতঃ স্বরূপতঃ একই জিনিষ তবে তাহার একটি আমাদের গোচর ও পরিচিত, অপরটি দূরের ও অজ্ঞাত। দেহ আত্মারই বিগ্রহ, প্রকাশ বা প্রতীক। প্রতীকের পূজা করি, প্রতীকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া। দেহগত আনন্দের মতই যেন আত্মার আনন্দ আমাদের স্ফুট জাগ্রত হইয়া উঠে। কামের আনন্দ যেমন একটা মৌলিক শক্তি—তীব্র ভীষণ দুর্ব্বার; ভাগবত রসও যেন তেমনি তীব্র ভীষণ দুর্ব্বার মৌলিক শক্তিরূপে আমাদের অন্তরের নিত্য নৈমিত্তিক বস্তু হইয়া উঠে। যে ধর্ম্মভাব শুধু মস্তিষ্কের জিজ্ঞাসা, শুধু কল্পনার ঔৎসুক্য, শুধু চিত্তাবেগের মত্ততা, যাহা দিনক্ষণের অবসর ও সুযোগ মত দেখা দেয়, তাহা সত্যকার বস্তু নয়, তাহার মধ্যে নাই অব্যর্থতা। অধ্যাত্ম প্রেরণা যেন শারীর প্রেরণার মতই সারা জীবনের সহজ বস্তু হইয়া উঠে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ তাই ত ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেছেন "হে ভগবান! বিষয়ের প্রতি বিষয়ীদের যে অনুরাগ তোমার প্রতিও আমার যেন সেই অনুরাগই হয়।" দেহগত উপভোগে যে লাস্য যে সৌন্দর্য্য ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহার যে তীব্র নিবিড় আনন্দ বিশ্বসৃষ্টির মূল ভিত্তি, নীচের প্রতিষ্ঠা বাঁধিয়া দিয়াছে, অধ্যাত্ম-জীবনে সৃষ্টির চূড়ায়, উপরের আদর্শেও তেমনি এক জাগ্রত আনন্দের লাস্য সৌন্দর্য্য লীলায়িত। উপরের চিদানন্দ ধারাই নামিয়া আসিয়া কামানন্দে পরিণত হইয়াছে—মন্দাকিনীয়

অধোভাগেরই নাম ভোগবতী। প্রাকৃত জীবনে যে অব্যর্থ সৌন্দর্য্য, যে অটুট ছন্দ শিল্পী প্রকট করিয়াছেন, হে মানব! তোমার অতিপ্রাকৃত, দিব্যজীবনও তেমনি অব্যর্থ সৌন্দর্য্য অটুট ছন্দ লইয়া জাগ্রত হউক, তোমার অধ্যাত্ম-জীবন লৌকিকজীবনের মতই সুস্পষ্ট সুষীম মূর্ত্ত আনন্দবিলাস হইয়া উঠুক—কামাখ্যা, কোণারক, আবুপাহাড়ের মন্দির আমাদিগকে এই বার্ত্তা শুনাইতেছে না কি?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

প্রাচ্য অধ্যাত্ম, পাশ্চাত্য অধিভূত। পাশ্চাত্যের ঝোঁক ইহলোকের দিকে, প্রাচ্যের ঝোঁক পরলোকের দিকে। সকল নিয়মেরই ব্যভিচার আছে, কিন্তু তাই বলিয়া নিয়ম অসত্য হইয়া পড়ে না। এই নিয়মটির সম্বন্ধেও সেই একই কথা। প্রাচ্যে চার্ব্বাকের অভাব হয় নাই, আবার পাশ্চাত্যে যে সেণ্ট ফ্রান্সিস ছিলেন না এমনও নয়। তবুও সাধারণভাবে লইলে আমরা বলিতে পারি, পাশ্চাত্যের জীবনস্রোতঃ ইন্দ্রিয়মুখী, প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়মুখী। প্রাচ্যজগতের মূল প্রতিষ্ঠা হইতেছে সনাতন সত্য যে আত্মা, পাশ্চাত্য পরিচিত শুধু বাহিরের সত্যের সহিত যাহার

* এই প্রবন্ধটী লেখকের "দেবজন্ম" নামক পুস্তকে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

খেলা স্থূলে, যাহা অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল। পক্ষান্তরে স্বভাবের এই বিভিন্নতার ফলে পাশ্চাত্য হইয়াছে কর্ম্মী, সচল, জাগ্রত, জীবন্ত, প্রাচ্য হইয়াছে ধ্যানপর, শান্তসমাধিমগ্ন, জীবনসম্পর্কশূন্য। বর্ত্তমান যুগে মানবজাতি চাহিতেছে এই দুইটির সমন্বয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক করিয়া একটা উদারতর বৃহত্তর আদর্শের মধ্যে সমস্ত জগতকে সহধর্ম্মী করিয়া তুলিতে। কারণ আজ আমাদের বোধগম্য হইতেছে এই যে দুইটি পৃথক ধর্ম্ম ইহারা একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ নয়। আত্মা ছাড়া শরীর অন্ধ, শরীর ছাড়া আত্মা অচল। আত্মার মধ্যে শরীরকে সচেতন করিয়া তুলিব, শরীরের মধ্যে আত্মাকে গতিশীল করিব—ইহাই নব সমন্বয়ের আদর্শ।

এই আদর্শটি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভেদটি আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে তাই উভয়ের সাহিত্যের কথা লইলাম। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতিনিধিস্বরূপ শেক্সপীয়রকে, প্রাচ্য সাহিত্যের প্রতিনিধিস্বরূপ বাল্মীকিকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। শেক্সপীয়র ও বাল্মীকির মধ্যে প্রভেদ কোথায়? শেক্সপীয়র পড়িয়া মনের উপর আমাদের কি ধারণা রহিয়া যায়? বাল্মীকি পড়িয়াই বা কোন্ ভাব আমাদের অন্তরে ভাসিয়া উঠে? শেক্সপীয়র অঙ্কিত করিয়াছেন মানবীয় চরিতচিত্র, বাল্মীকি অঙ্কিত করিয়াছেন লোকোত্তর চরিতচিত্র। শেক্সপীয়র মানুষকে শুধু মানুষরূপেই

দেখিয়াছেন, বাল্মীকি মানুষকে একটা বৃহত্তর কিছুর প্রতিনিধি বা নিদর্শনস্বরূপেই প্রকটিত করিয়াছেন। শেক্সপীয়রে জীবনের সহিত, জগতের সহিত ভৌতিক সম্বন্ধই অনুভব করি, পৃথিবীরই রসাস্বাদন করি, শরীরের দ্বারা শুধু যেন শরীরকেই আলিঙ্গন করিতেছি; বাল্মীকির মধ্যে জগৎকে শরীর দিয়া আমরা ধারণ করি না জগৎকে অনুভব করি, যেন ঊর্দ্ধতর স্তরের একটা নিগূঢ় কিছুর ভিতর দিয়া। প্রাকৃত মানুষ, প্রাকৃত জীবন ইহাই শেক্সপীয়র; অতি প্রাকৃত মানুষ, অতি প্রাকৃত জীবন ইহা বাল্মীকি। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট ম্যাকবেথ লীয়র দেখ, আর বাল্মীকির দেখ রাম রাবণ সীতা। শেক্সপীয়রের মানুষ মানুষই আর কিছু নয়, বাল্মীকির মানুষ মানুষ হইয়াও মানুষ নয়। যে সকল প্রেরণাবলীর সঙ্ঘাতে হ্যামলেট চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যতই জটিল হউক না কেন, বুঝিতে আমাদের পক্ষে ততটা কঠিন নয়, কারণ উহা আমাদের চিরপরিচিত আপনার জিনিষ। কিন্তু রাম চরিত্র বিশেষ জটিল নয়, তথাপি সবখানি তার কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কি? উহার পশ্চাতে একটা বিরাটত্ব, একটা অনন্তত্ব প্রহেলিকারূপ ছাইয়া রহিয়াছে, তাহা ঠিক মানবীয় গণ্ডীর মধ্যে ফেলিতে পারি না। রাম ও রাবণ এই অনন্তেরই এক এক মূর্ত্তি। রাম ও রাবণের মানবীয় লীলা একান্ত মানবীয় স্তরের ধর্ম্মেরই উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—তাহাদের মানবলীলাতরঙ্গভঙ্গ খেলিতেছে এক অগাধ অসীম-

সত্তার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের উপরে। এই অনন্তেরই বোধ হইতেছে প্রাচ্য, সান্তের অনুভব হইতেছে পাশ্চাত্য। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-গুরু হোমরকে লও। হোমরের মানুষ বিরাট বিপুল হইলেও মানুষ। একিলিস, হেক্টর মানুষ স্বভাবেরই রাজসংস্করণমাত্র, তাহারা অনন্তের প্রতিমূর্ত্তি নহে। সান্তের, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সান্তের, ইন্দ্রিয়ের বিশেষত্বকে গোচর করা পাশ্চাত্যের দীক্ষা; আর সান্তের সাহায্যে, সান্তকে ইন্দ্রিয়কে উপলক্ষ করিয়া মাত্র, অনন্তকে অতীন্দ্রিয়কে পরিস্ফুট করিয়া তোলা প্রাচ্যের দীক্ষা।

আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইবে যদি আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্র অথবা ভাস্কর্য্যের তুলনা করি। পাশ্চাত্যের ভিনস মূর্ত্তি লও, আর লও ভারতের বুদ্ধমূর্ত্তি। প্রভেদ কোথায়? ভিনস নামে দেবী প্রকৃতপক্ষে মানবী। সুঠাম দেহ, সুবলয়িত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু কর্ণ নাসিকা ললাট কপোল অনবদ্য—এক কথায় নিখুঁত সুন্দরী। কোমলতা, প্রেমপ্রবণতার, মাধুরী শরীরের পর্ব্বে পর্ব্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী প্রেমিকা নারীর এক মূর্ত্তি কল্পনায় যতদূর বিশিষ্ট করিয়া গড়িতে পারি তাহা হইতেছে ঐ গ্রীসের ভিনস দেবী। কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখ—উহা অনবদ্যাঙ্গ নহে। আকার মানুষের বটে, কিন্তু শরীরতত্ত্ববিৎ গণিতকার উহাতে অনেক ভুল অনেক অসামঞ্জস্য হয়ত দেখাইয়া দিবেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্যানীবুদ্ধ ধ্যানস্থিত কোন মানুষের প্রতিমূর্ত্তি নয়। উহা হইতেছে মূর্ত্তধ্যান। প্রাচ্য-

শিল্পের ইহাই বিশিষ্টতা—মানুষকে আঁকিয়া, তাহার মধ্য দিয়া ভাব কিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে প্রাচ্যশিল্প তাহা দেখায় না। প্রাচ্যশিল্প চাহে সেই ভাবটিকেই শরীর করিয়া দেখাইতে। বুদ্ধ যখন নির্ব্বাণের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছেন তখন তিনি যে অনুভূতি যে ভাবের আধার সেই অতীন্দ্রিয় ভাব ও অনুভূতিরই একটা অখণ্ড স্থূলমূর্ত্তি প্রস্তরে কাটিয়া তুলিয়াছেন বৌদ্ধশিল্পী। হস্ত পদ মুখ নির্দ্দোষ সুন্দর হইল কিনা তাহা তিনি দেখেন না—তিনি দেখেন হস্ত পদ মুখ কতটুকু ব্যক্ত করিল বুদ্ধত্বকে। কপালে চিন্তার রেখা অথবা শান্তির বিমলতা, চক্ষে ক্রোধের অগ্নি অথবা প্রেমের বৈদগ্ধ, পুরুষের শাল প্রাংশু পেশীবহুল ভুজদ্বয়, নারীর সুকোমল মসৃণ বাহুলতিকা—এইরূপে বাহ্যপ্রকাশেরই উপর জোর দিয়া চিত্তবৃত্তির খেলা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন পাশ্চাত্য শিল্পী। প্রাচ্য শিল্পী শরীর ও মনের পশ্চাতে বৃত্তির যে সনাতন ও সত্য ভাব তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, বাহ্যপ্রকাশ, শরীরের বিকারাদি যাহা সর্ব্বদাই দেখি, তাহাকে অতিমাত্র ফলাইয়া দেখান নাই, যতটুকু যে প্রকারে দেখাইয়াছেন তাহা সেই সত্যভাবেরই মধ্যে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, নটরাজ প্রভৃতির মূর্ত্তিতে, জ্ঞান করুণা, শক্তি এইরূপ নানা চিরন্তন ভাবমাত্রকে অনন্তেরই অভিজ্ঞা হইতে বাহির করিয়া প্রস্তরীভূত করিয়াছে প্রাচ্য ভাস্কর্য্য। রাফাএল তাঁহার 'মাদোনা'র মুখে এক দৈব মাতৃভাব ফুটাইয়া-

তুলিয়াছেন কিন্তু তাহাও প্রাচ্য শিল্প নহে। 'মাদোনা' আদর্শ মাতা, মাতৃত্ব নহে। 'মাদোনা' ভাবুকতার চরমসৃষ্টি কিন্তু বুদ্ধে স্তূপীকৃত হইয়াছে সমাধিদৃষ্ট জ্ঞানের ফল। অনন্তের মধ্যে, ঐক্যের মধ্যে বস্তুর যে স্বরূপ যে সত্য, প্রাচ্য তাহাই খুঁজিতেছে। পাশ্চাত্য রহিয়াছে বিশিষ্টের, বৈচিত্র্যের, পৃথকত্বের মধ্যে।

সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি বীঠোবেন (Beethoven)। বিঠোবেনের তানে পাশ্চাত্যের প্রাণ যেরূপ স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। ধ্বনি-তরঙ্গের মধ্য দিয়া বীঠোবেন প্রকটিত করিয়াছেন মানব-অন্তরের বিচিত্র প্রেরণারাশী, তাহাদের ভৈরব সংঘর্ষ-নিনাদ। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে, শৌর্য্যে, দম্ভে প্রকৃতির সকল প্রকার উচ্ছ্বলিত উদ্বেলিত প্রেরণা পুঞ্জ পুঞ্জ করিয়া তিনি এক বিরাট জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির যে দ্বন্দ্বময় ভিন্নমুখী সহস্র-ধারা গতি-ভঙ্গী তাহাই বীঠোবনের জগৎ। মনে হয় যেন মদমত্ত হস্তী তরুলতা-সঙ্কুল পথহীন ছেদহীন গহন অরণ্যকে তাড়িত মথিত উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। হস্তীর বৃংহিত পশুপক্ষীর চীৎকার, বৃক্ষশাখার মড়মড়ধ্বনি সকলে মিলিয়া যেন প্রলয়-ডমরু বাজাইয়া তুলিয়াছে। বীঠোবেনের প্রতিভা, জগতের এই সুরলয়হীন হট্টগোলকে মহীয়ান করিয়া, হৃদয়স্পর্শী করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গীত শোন—শোন ত্যাগরাজ্যের একটি কীর্ত্তন—কি

শান্ত, কি ধীর, অথচ কি গভীর কি উদাত্ত। সুরের সে বিরাট বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু একটিমাত্র ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আমরা উঠিয়া চলিয়াছি মরলোক ছাড়িয়া কোন্ অনন্ত শান্তের কোলে। বহু-প্রকার ধ্বনির সমাবেশেই ইউরোপের সঙ্গীত আপনার প্রকাশক্ষমতা দেখাইতে পারে—ইউরোপের সঙ্গীতের গর্ব্ব Harmony ; ভারতে কিন্তু Melody—একটিমাত্র সুরকে খেলাইয়াই, একটি রসকে ফুটাইয়া সেই রসেই মজিয়া থাকিতে চাহিয়াছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গীত প্রকৃতির বহুল চিত্রবিচিত্রতার ছবি, প্রাচ্যের সঙ্গীত অতিপ্রকৃতির, একের ছবি।

তারপর উভয়ের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মজীবনের পরিণতি দেখ। ইউরোপের ধর্ম্ম কি? গ্রীসই বর্ত্তমান ইউরোপের জননী, গ্রীসের দীক্ষা রোমকের দীক্ষার মধ্যে দিয়া আধুনিক ইউরোপকে গড়িয়া তুলিয়াছে। গ্রীস ধর্ম্ম বলিয়া কি বুঝিত? যাহা শালীন যাহা শোভন যাহা যথাযোগ্য পরিমাণযুক্ত গ্রীকের কাছে তাহাই ধর্ম্ম। অন্তরের কোন নিগূঢ় স্বপ্রতিষ্ঠিত স্বরাট সত্তার সন্ধান তাহারা পায় নাই। বহিঃপ্রকাশের দিকে, তালমান সামঞ্জস্যের দিকেই ছিল গ্রীসের দৃষ্টি। রোমের ধর্ম্ম ছিল বীর্য্য, জিগীষা। গ্রীসের শোভনতা-প্রিয়তা রোমকের ক্ষাত্র-স্বভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে এক প্রকার Aggressive morality সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই হইতেছে ইউরোপের ধর্ম্ম। উহা চায় সাধারণ কর্ত্তৃক সম্মত,

কতকগুলি নীতিসূত্র অনুসারে চলিতে, তদ্দ্বারাই জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে। পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া পারিপার্শ্বিকের তাড়নায় ভাল-মন্দের একটা মানদণ্ড খাড়া করিয়া ইউরোপ এক নীতিতন্ত্র রচনা করিয়াছে—ইউরোপে ধর্ম্মজীবন বলিতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রেরণা এই নীতিতন্ত্র হইতে, আর ইহাকেই সে আজ সমস্ত মানবজাতির উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের নিম্নতর স্তরের প্রবৃত্তিগুলিকেই কোনরূপে সাজাইয়া গুছাইয়া, তাহাদের দ্বন্দ্ব কোনরূপে মিটমাট করিয়া সহজে ও সুখে জীবন যাপন করা ইহার বেশী ইউরোপের ধর্ম্ম দিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে আমরা যে **Association, Arbitration, Federation** প্রভৃতির কথা চারিদিকে শুনিতেছি তাহা ইহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। জর্ম্মণীর **Deutschtum** এই শোভনতা, এই নীতিবাদের ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া এক গভীরতর প্রেরণার উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে খুঁজিতে যাইয়া অহংজ্ঞানকে, ভগবৎ শক্তিকে খুঁজিতে যাইয়া আসুরিক প্রাণশক্তিকেই সার সত্য বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে। প্রাচ্যের ব্যবহারশাস্ত্র রহিয়াছে কিন্তু উহাকে ধর্ম্মজীবনের শেষ কথা বলিয়া কোনদিনই সে মানে নাই। এবং সেইজন্যই অপরাপ্রকৃতির খেলার মধ্যেই আপনাকে সর্ব্বথা আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে আরও উচ্চে। ইউরোপ আপনাকে খৃষ্টের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়।

কিন্তু ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরিণতি কোথায়, এক লুথরকে দেখিলেই তাহা সব বুঝিতে পারি। খৃষ্টীয় চর্চ্চ প্রথম হয় Church militant—বর্ত্তমানে হইয়াছে Church political. খৃষ্টীয় চর্চ্চের লক্ষ্য ছিল স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা, কিন্তু বস্তুতঃ স্থাপনা করিয়াছে পার্থিব রাজ্য। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের ধর্ম্মের গতি আবার অন্যদিকে। প্রাচ্যের আদর্শ ছিল বৈদিক ঋষিগণ—বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ যাঁহাদের কামনার বস্তু ছিল সেই পরম ব্যোম। তাঁহাদের বংশধরগণ এই পরমকে এতই দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে যে আর যে কিছু আছে তাহারা জানে না। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পরিণতি বুদ্ধ শঙ্কর। পাশ্চাত্য ধর্ম্মকে ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়াছে, শেষে জগতের মধ্যে ধর্ম্মকে একেবারে হারাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। প্রাচ্য ধর্ম্মকে ঊর্দ্ধে লইয়া চলিয়াছে, শেষে ব্রহ্মের মধ্যে জগৎকে হারাইতে বসিয়াছে। তাহার ধর্ম্মতত্ত্ব সাধু সন্ন্যাসীর একাধিপত্য, তাহার ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান মঠাদি অরণ্যে পর্ব্বতে।

কর্ম্মজীবনে পাশ্চাত্যের আদর্শ আলেকসন্দর, সীজর, নেপোলিয়ন। প্রাচ্যের আদর্শ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীষ্ম। পাশ্চাত্যের কর্ম্মবীর—চঞ্চল, মত্ত, অসুর। প্রাচ্যের কর্ম্মবীর—শান্ত, স্থিতধী, দেবতা। নেপোলিয়ন ভগবানের বিরাট বিভূতি, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু পাশ্চাত্য ধর্ম্মকে অধ্যাত্মকে যেমন আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, প্রাচ্যও তেমনি কর্ম্মকে, অধিভূতকে

নিজস্ব করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইউরোপ যেমন খৃষ্টকে ভুলিয়াছে, ভারতবর্ষও তেমনি কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে, তাই জীবনক্ষেত্রে প্রাচ্যকে দেখি দ্বন্দ্বের ভূমি এই জীবন হইতে অপসৃত হইয়া জগতের অতীত যে মিলনভূমি সেই ভগবানে বা ব্রহ্মে মিলিয়া যাইতে। জগতে সংঘর্ষসঙ্কুল কর্ম্মাবলী ক্রমে ক্রমে সহজ করিয়া আনিতে—যতটুকু জীবনধারণ করিবার জন্য প্রয়োজন, যতটুকু ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ভূত করিয়া লওয়া যায় ততটুকুমাত্র কর্ম্ম করিতে। পাশ্চাত্য লইয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা। জীবনকে জগৎকে যতখানি স্পষ্ট, জাগ্রত করা সম্ভব তাহাই করিতে হইবে। জগতের সহিত নূতন নূতন কর্ম্মের বন্ধন সৃজন করিতে হইবে। কোন কর্ম্মই বৃথা নয়, কোন কর্ম্মই ক্ষুদ্র নয়। বরং কর্ম্ম যতই ক্ষুদ্র হয় জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধও তত গভীর তত ঘনিষ্ঠ হয়। হিকেল ক্রে-মৎস্যের জীবনব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়াই তাঁহার আয়ুঃক্ষয় করিতে প্রস্তুত। মেরুকেন্দ্রে একটি পতাকা প্রথিত করিয়া আসাই কত জনের জীবনলক্ষ্য হইয়াছে। প্রাচ্য ইহাকে বালকের খেলা বলিয়া হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবে। যে সকল অপরাবিদ্যা প্রাচ্য একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যারই সহিত একটা সম্বন্ধে সংযুক্ত না করিয়া সে তৃপ্তি পায় নাই। তমেবৈকংজানথ, অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ—প্রাচ্যের ইহাই মূলমন্ত্র।

সত্ত্বপ্রকৃতি প্রাচ্য চাহিয়াছে সৎ—যাহা স্থাণু, অদ্বৈত, অনন্ত। বহুর মধ্যে যাহা এক, চঞ্চলের মধ্যে যাহা শান্ত, পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা শাশ্বত, ক্ষুদ্রের মধ্যে যাহা বৃহৎ, যাহা স্বরূপ বা অরূপ—প্রাচ্য তাহাকেই খুঁজিয়া লইয়াছে। রজঃপ্রকৃতি পাশ্চাত্য চঞ্চলতা, দ্বন্দ্ব, কোলাহল, বৈচিত্র্য, নিত্যনবসৃষ্টি, রূপকেই বুঝিয়াছে। প্রাচ্যের হইতেছে অতীন্দ্রিয়বোধ, অপরোক্ষানুভূতি, দিব্যদৃষ্টি আর পাশ্চাত্যের বুদ্ধি, মেধা, মনীষা। স্ব স্ব আদর্শের মধ্যে উভয়েই অতিমাত্র আবদ্ধ, তাই একদিকে তাহাদের লাভ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে। প্রাচ্য আত্মাকে চিনিয়াছে তাই সে মহান্, গভীর। কিন্তু শুধুই আত্মাকে চিনিয়াছে বলিয়া সে ঋদ্ধিমান নয়, বিরাট নয়,—সে বৈচিত্র্যহীন। প্রাচ্য স্বরাজ্য চাহিয়াছে কিন্তু স্বরাজ্যের পূর্ণতা যে সাম্রাজ্য—একথা বুঝিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য শরীরকে বুঝে, তাই বিচিত্রতার ঐশ্বর্য্য সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু শরীরের মধ্যে আত্মার প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া তাহার এই ঐশ্বর্য্য ক্ষণভঙ্গুর—বাহ্য চাকচিক্যের মধ্যেই উহা পর্য্যবসিত হইয়াছে। জীবনের রস সে সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু আত্মার সজ্ঞান আনন্দের অভাবে, তাহা একেবারে অমৃত হইয়া উঠিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যসিদ্ধি চায়, কিন্তু বলাৎকার করিয়া, গ্রাস করিয়া, স্থূল উপকরণাদিরই একমাত্র সাহায্য লইয়া—অন্তরের গভীরতম ঐক্য, পরিপূর্ণতারই যে উহা সহজ ফল এ কথা বুঝিবার

তাহার ধৈর্য্য নাই। প্রাচ্য সত্যপ্রতিষ্ঠা পাইয়াছে কিন্তু তাহার উপর লীলাভবন নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই। পাশ্চাত্য সর্ব্বদাই চাহিয়াছে সুরম্য হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলিতে—কিন্তু বালুকার উপর। পাশ্চাত্য বহুকে, রূপকে লইয়া ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কিন্তু তরল, প্রাচ্য এককে, অরূপকে লইয়া গভীর কিন্তু নগ্ন।

নবযুগে আমরা প্রাচ্যের আত্মোপলব্ধি চাই, নিখিল বস্তুর যে সত্য প্রতিষ্ঠা সেই এককে সেই অসীমকে সর্ব্বাগ্রে চিনিব ও সর্ব্বদা তাহার মধ্যেই বাস করিব কিন্তু বস্তু সমুদায় হইতে, জগৎ হইতে বিযুক্ত হইয়া নয়। শুধু অব্যক্ত নয়, প্রকাশেরও যে নিজস্ব একটি রস আছে, প্রত্যেক বস্তুরই যে বিশেষ উপায়ে, বিশেষ প্রকারে আনন্দ দিবার ক্ষমতা আছে পাশ্চাত্য হইতে এইটুকু শিখিব। কিন্তু এই যে বিশেষত্ব ইহা অল্পের বিশেষত্ব নহে, ইহা বৃহতেরই বিশেষত্ব, এই জ্ঞানটুকু প্রাচ্য হইতে আহরণ করিয়া লইব। অনন্তের মধ্যে সব কিছুকেই এক ছাঁচে ঢালিব না কিন্তু এই অনন্তের দ্বারাই অপরিমেয় বৈচিত্র্যের বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি, আপন আপন রস ফুটাইয়া তুলিব। পৃথিবীর, মাটীর যে স্বাদ তাহা অনির্দ্দেশ্যের আনন্দে মিশাইয়া হারাইয়া ফেলিব না, অনির্দ্দেশ্য যাহা তাহা উহার বিশিষ্টতাকেই স্পষ্টতম, পূর্ণতম, সত্যতম করিয়া তুলিবে। জীবনের শতব্যাপারকে শতরূপে জাগ্রত করিয়া ধরিব কিন্তু

পাশ্চাত্যের মত সেই One thing needfulকে ভুলিয়া নয়। পরম পুরুষেরই চারিদিকে সকল বিভূতি, সকল শ্রী সাজাইয়া উঠাইব—দশভূজারই দশবাহু দশদিকে প্রসারিত থাকিবে।